এ কে খন্দকার

মঈদুল হাসান

এস আর মীর্জা

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর

কথোপকথন

এ কে খন্দকার

মঈদুল হাসান

এস আর মীর্জা

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর

কথোপকথন

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর

ষষ্ঠ মুদ্রণ : চৈত্র ১৪২০, মার্চ ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪১৬, ডিসেম্বর ২০০৯
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন
৮৫/১ ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২৫০ টাকা

Muktijuddher Purbapar
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 250 only

ISBN 978 984 8765 22 7

ভূমিকা

যখন কোনো ঐতিহাসিক আন্দোলন বা রূপান্তরের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিপুলসংখ্যক মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েন, তখন তাঁদের সাক্ষ্য ও প্রতিবেদনাদি সংগ্রহ করা যথার্থ ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় পন্থা হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসি বিপ্লবের পর সঠিক ইতিহাস রচনার জন্য এই পন্থা সম্পূর্ণ নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ যে সাক্ষ্য-তথ্য দেন বা রেখে যান, তা জাতীয় ইতিহাসের অনন্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ একটি দেশের জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য ইতিহাস হচ্ছে অন্যতম এক চালিকাশক্তি।

পর্যাপ্ত গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার জন্য ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সেগুলোর সংরক্ষণ এবং সেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে এসেছে।

১৯৯৬ সালে কেন্দ্রের উদ্যোগে কথ্য ইতিহাস প্রকল্প নামে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রায় পঁচিশ শ প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর মৌখিক বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত মৌখিক বিবরণ ট্রান্সক্রাইব করে প্রয়োজনীয় সম্পাদনার পর মোট ২২ খণ্ডে (প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা) গ্রন্থিত করা হয়েছে। পাঁচটি বইও (মুক্তিযুদ্ধে কসবা, বরিশাল, দিনাজপুর, খুলনা-চুয়াডাঙ্গা ও রাজশাহী) প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া প্রকাশ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা নিয়ে আরও তিনটি খণ্ড।

কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে কেন্দ্রের উদ্যোগে অডিও ক্যাসেটে ধারণ করা হয় তিনজন বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারীর যৌথ আলাপ। এতে অংশগ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান সেনাপতি এ কে খন্দকার, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও পরবর্তীকালে প্রকাশিত *মূলধারা '৭১* খ্যাত গ্রন্থের লেখক মঈদুল হাসান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গঠিত যুব শিবিরের মহাপরিচালক এস আর মীর্জা। তাঁদের এই যৌথ আলাপ চলে নয় দিন (৪, ৭, ৯, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২১ সেপ্টেম্বর ও ১৭ অক্টোবর) ধরে। অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত এই যৌথ আলাপ অনুলিখন করার পর আলোচকেরা তাঁদের নিজ নিজ অংশ পড়ে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সম্পাদনা করেছেন। তারা যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অভিমত।

এই যৌথ আলোচনায় আলোচকেরা মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তী পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয় খোলামেলাভাবে তুলে ধরেন। এই বিষয়গুলো ইতিপূর্বে তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। তাঁদের আলোচনায় তখনকার ঘটনার পাশাপাশি আগের ও পরের ঘটনার প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে।

প্রথমা প্রকাশন এই তিন বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারীর সাক্ষ্য ও যৌথ আলাপ বই আকারে প্রকাশ করতে সম্মত হওয়ায় আমি আনন্দিত। এই যৌথ আলাপ ধারণকাজে ড. সুকুমার বিশ্বাস ও ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং এর অনুলিখন ও প্রাথমিক সম্পাদনায় সহায়তা করেন ড. সুকুমার বিশ্বাস ও তারা রহমান। সবশেষে এগুলোর গ্রন্থনায় সহায়তা করেছেন তারা রহমান। এঁদের সবার ঐকান্তিকতায় এই বইয়ের প্রকাশ সম্ভব হলো।

সালাহউদ্দীন আহমদ
সভাপতি
মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র

নভেম্বর ২০০৯

অসহযোগ আন্দোলন প্রতিরোধযুদ্ধ

মঈদুল হাসান : ১৯৭১ সালে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে জড়িত ছিলেন, তাঁদের মৌখিক সাক্ষ্য বা বিবরণ গ্রহণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে 'ফিরে দেখা' একাত্তর নামে এই যৌথ আলাপের আয়োজন করা হয়েছে, প্রত্যেকের সেই সময়ের কর্মকাণ্ড ও অভিজ্ঞতা জানার জন্য। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে গেলে তার আগের ঘটনাও আলোচিত হওয়া দরকার। আমি প্রথমে এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকারকে এই আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করছি। ১৯৭১ সালে আপনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, অর্থাৎ বাংলাদেশে, পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান হিসেবে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের মনোভাব কী অবস্থায় ছিল?

এ কে খন্দকার : ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তারও আগে থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে আরও জোরদার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর জোর তৎপরতা—এ দুটি বিষয় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে কর্মরত এবং পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি সদস্যরা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আন্দোলন জোরদার হওয়ার পটভূমিতে এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ব্যাপক যুদ্ধ তৎপরতার মুখে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা দেশের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বুঝতে পারেন। তাঁরা মনে করতে থাকেন যে তাঁদের

প্রস্তুতি দরকার। এ জন্য তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন আওয়ামী লীগের তরফ থেকে তাঁদের প্রতি কোনো নির্দেশ বা কোনো সিদ্ধান্ত আসে কি না।

আমি খুবই গভীরভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ করতাম এবং এই খবরগুলো অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার এস আর মীর্জা এবং অন্যদের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ মহলে পৌঁছে দিতাম। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য ও হতাশার বিষয় হলো, এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে আমাদের কেউ কিছু জানায়নি। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পথে। কিন্তু আমাদের করণীয় কী—এ প্রসঙ্গে আমাদের কিছুই জানানো হয়নি। কোনো নির্দেশ আমরা পাইনি। এ থেকে আমাদের, অর্থাৎ কর্মরত বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের মনে হয়েছিল, আসলে আওয়ামী লীগের দিক থেকে কোনো প্রকার যুদ্ধপ্রস্তুতি নেই। এমনকি এ-সংক্রান্ত কোনো চিন্তাভাবনাও তাদের ছিল বলে মনে হয়নি।

ফলে ২৫ মার্চ ঢাকাসহ সারা দেশে যখন পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করল, তখন এটা প্রতিরোধের জন্য বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। এটা ছিল বাস্তব সত্য। তবু পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সেনাসদস্যরা যে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হন—এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। বিনা প্রস্তুতিতে সীমিত অস্ত্রপাতি নিয়ে তাঁরা যে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করেন, এটা একটা উল্লেখযোগ্য দিক। ফলে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল। এই ক্ষতি হতো না, যদি বাঙালি সেনাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের উচ্চ মহল থেকে পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত করা হতো। এরপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহী বাঙালি কর্মকর্তারা একত্র হন তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে। এটা হলো ৪ এপ্রিল। এখানে ওসমানী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তবে তিনিও গিয়েছিলেন হঠাৎ অবস্থার মুখে পড়ে, কোনো প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই। ওই সভায় বাংলাদেশের সীমান্তকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই দায়িত্বের পেছনে কোনো প্রকার আর্থিক, সাংগঠনিক বা সামরিক সমর্থন বা সামর্থ্য ছিল না।

এ পর্যায়ে অর্থাৎ এপ্রিলের প্রথম দিকে যুদ্ধ আস্তে আস্তে ঢাকা থেকে সীমান্তের দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই প্রতিরোধযুদ্ধে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা যেমন নিহত বা আহত হয়েছিলেন, তেমনি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। এর পরই বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়, বিভিন্ন সেক্টর গঠিত হয় ইত্যাদি।

মঈদুল হাসান : এর সঙ্গে আমি একটা কথা যোগ করতে চাই। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৫ মার্চের আগে থেকে কিছু বাঙালি ইউনিট, সেনাবাহিনী ও ইপিআরের কোনো কোনো ইউনিটকে নিরস্ত্র করতে শুরু করে। ২৫ মার্চের পর যখন কতগুলো সেনা ও ইপিআর ইউনিট বিদ্রোহ ঘোষণা করল, তখন পাকিস্তানি বাহিনী

তাদের হত্যা করতে শুরু করল। এর ফলে অনেক লোক মারা গেছে। স্বাধীনতার পর এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো তথ্য সংগৃহীত হয়েছে কি না আমি জানি না।

আরেকটি বিষয়, অনেক জায়গায় সেনাদের চাপে পড়ে অনেক সেনা কর্মকর্তা স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে এলেন। বিদ্রোহ করার পর তাঁদের কিন্তু ফিরে যাওয়ার আর কোনো পথ খোলা রইল না। ফিরে গেলেই কোর্ট মার্শাল—এটা তাঁরা খুব ভালো করেই জানতেন। সেই বোধ থেকেই তেলিয়াপাড়ায় যে সভা হয়েছিল, সেখানে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য একটা সরকার গঠন করা প্রয়োজন। এই সরকার স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এবং সেই সরকারের অধীনেই যুদ্ধ পরিচালিত হবে—এ বিষয়ের ওপর তাঁরা জোর দেন। এটা ছিল একটা মনুমেন্টাল সিদ্ধান্ত। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধ চালানোর পক্ষে এবং স্বাধীন সরকার গঠনের পক্ষে তখনই একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শক্তি তৈরি হয়ে গেল। নয় মাসের যুদ্ধকালে আপস-মীমাংসার কথা বারবার উঠেছে। হয়তো রাজনৈতিক নেতারা আপস-মীমাংসায় যেতে পারতেন। কিন্তু এই বিদ্রোহী সামরিক কর্মকর্তা ও সেনাদের পক্ষে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ খোলা ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের এটা ছিল একটা শক্তিশালী অবলম্বন।

এ কে খন্দকার : এখানে আমি দুটি বিষয় তুলে ধরছি। একদিকে ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ায় সেনা অধিনায়কদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে ৩ এপ্রিল তাজউদ্দীন সাহেব ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি এই মর্মে তাঁকে আভাস দেন যে স্বাধীন বাংলাদেশে একটি সরকার গঠিত হয়েছে। তিনি নিজেই এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) তখনকার প্রধান কে এফ রুস্তামজী এ ব্যাপারে তাজউদ্দীন আহমদকে সহায়তা করেছিলেন। সুতরাং এ দুটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটেছিল। একটি স্বাধীন সরকারের প্রধান বলে পরিচয় দেওয়ার কারণে তাজউদ্দীনের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যায়।

মঈদুল হাসান : আসলে এখানে একটু তথ্যের অস্পষ্টতা আছে। তাজউদ্দীন আহমদ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন ৩ এপ্রিল। সেদিন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে রাত ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে প্রথমবার দেখা হতেই তিনি বলেন, আমরা একটা সরকার গঠন করে ফেলেছি। ভারতীয় সূত্রে অন্য বক্তব্যও আমি শুনেছি। ভারতীয় পক্ষ থেকে তাঁকে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে তোমরা একটা সরকার গঠন করলেই কেবল আমরা সাহায্য করতে পারি। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীনের দেখা হওয়ার আগে ইন্দিরা গান্ধীর সচিব পি এন হাকসার সরকার গঠনের ব্যাপারে তাঁর প্রতি এই ইঙ্গিতই রেখেছিলেন। এখন এই ইঙ্গিতে হোক বা নিজের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে হোক কিংবা বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআরদের প্রতিরোধযুদ্ধের খবর

পেয়েই হোক, সম্ভবত সবকিছু বিবেচনা করে দ্রুত সরকার গঠনের পক্ষে তাজউদ্দীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এ কে খন্দকার : তেলিয়াপাড়ার বৈঠক বা তাজউদ্দীন আহমদের সরকার গঠনের কথা ছাড়াও এর আগের আরেকটি বিষয় আছে। এটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। ২৫ মার্চের পর সারা বাংলাদেশে বাঙালি সেনা ইউনিটগুলো প্রতিরোধযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ করলে তাদের কোর্ট মার্শাল হবেই। এটা জেনেই তারা বিদ্রোহ করেছে। অনেকে হয়তো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেকে আছেন, যাঁরা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। এ সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইতিবাচক। ভারত সরকারের বাংলাদেশকে এই সাহায্য করতে এগিয়ে আসার কারণ হলো, ২৫ মার্চের পর ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, এটা ভারত সরকারের অজানা ছিল না। এই যুদ্ধে দেশের আপামর জনসাধারণও অংশ নেয়। এ বিষয়গুলো ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনদানের ইতিবাচক পটভূমি তৈরি করছিল। তাই এই প্রতিরোধযুদ্ধের গুরুত্বকে কোনোক্রমেই খাটো করে দেখা যায় না।

মঈদুল হাসান : পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি ইউনিটগুলো যুদ্ধ করে এই কারণে যে, পাকিস্তানি বাহিনীই প্রথম ইপিআর ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ওপর একযোগে আক্রমণ করে। এ অবস্থায় ইপিআর ও পুলিশ বাহিনী তাদের নিজ নিজ ওয়্যারলেসে এসওএস জানায় যে আমরা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আক্রান্ত। ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষত বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সদস্যরা একযোগে বিদ্রোহ করেন; যদিও পরবর্তীকালে এটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের আহ্বানে তাঁরা বিদ্রোহ করে যুদ্ধে নেমেছেন, এটা অসত্য। আসল ঘটনা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের আক্রমণ করেছে, এবং আক্রান্ত হওয়ার পর তারা বিদ্রোহ করেছে।

এ কে খন্দকার : মঈদুল হাসান সাহেব যা বললেন, এর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমি এর সঙ্গে আর একটু যোগ করতে চাই। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা ও চট্টগ্রামে যে ঘটনা ঘটল, সে খবর সারা দেশে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত পাবনা, যশোর, কুমিল্লা, রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামসহ সারা দেশে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের পাল্টা আক্রমণ করে। পাবনায় পুলিশ, ইপিআর পাকিস্তানিদের আক্রমণ করে পরাজিত করে। কুষ্টিয়ায় বড় যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ছিল

পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। এতে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক ক্ষতি হয়। তাদের অনেকে নিহত, অনেকে আহত হয় এবং অনেককে আটকও করা হয়।

এখানে কয়েকটি দিক আমাদের দেখতে হবে। প্রথমত, এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কোনো প্রকার রাজনৈতিক নির্দেশ ছাড়াই। এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন, যদি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে যুদ্ধ শুরু হতো, তাহলে এই যুদ্ধে আমরা অনেক বেশি ভালো করতে পারতাম। এর চেয়ে বড় সত্য উপলব্ধি আর হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানিদের আক্রমণের প্রথম দিকটি ছিল রক্ষণাত্মক যুদ্ধ। এ খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হন। এভাবেই যুদ্ধের প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল।

মঈদুল হাসান : এ কে খন্দকার তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। আপনি (এস আর মীর্জা) মার্চ মাসের ঘটনা সম্পর্কে কী জানেন?

এস আর মীর্জা : ১৯৭১ সালের মার্চে আমি লক্ষ করলাম, পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। আমি পাকিস্তান বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলাম। ২ মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বিমানবাহিনীর অফিসে গিয়ে আমি জানতে চেষ্টা করি কী হচ্ছে, কী হতে চলেছে। আমি কথা বলি এ কে খন্দকারের সঙ্গে। তিনি আমার জায়গাতেই বদলি হয়ে এসেছিলেন। পরে আমি তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় আমি লক্ষ করলাম, তিনি খুবই অস্থির হয়ে আছেন। তিনি আমাকে বাগানে যেতে বললেন। আমি বুঝলাম, তিনি একান্তে আমাকে কিছু বলার জন্য বাগানে যেতে বলেছেন, যাতে অন্য কেউ আমাদের আলোচনা শুনতে না পায়। ওখানে গিয়ে তিনি আমাকে কয়েকটি বিষয় অবহিত করলেন। এর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ। এক. নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগের হাতে পাকিস্তানিরা কোনোক্রমেই ক্ষমতা হস্তান্তর করছে না। দুই. সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে রংপুর সেনানিবাস থেকে ১২টি ট্যাংক ঢাকার কুর্মিটোলায় নিয়ে এসেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আওয়ামী লীগের কোনো যুদ্ধপ্রস্তুতি আছে কি না এবং তা জানার জন্য আমাকে বললেন। যুদ্ধ বলতে ওই বাঁশের লাঠি দিয়ে নয়! অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ।

তখন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের এক নেতা ছিল আমার আত্মীয়। ওই অবস্থায় আমি তাকে গিয়ে বললাম, আওয়ামী লীগের যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার জন্য। দুদিন পর সে আমাকে জানাল, আওয়ামী লীগের কোনো প্রকার যুদ্ধপ্রস্তুতি নেই, এমনিতেই আন্দোলন চলছে। তখনো ওসমানী সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তিনি ঢাকাতেই ছিলেন। সে সময় আমি রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছিলাম স্বাভাবিকভাবেই। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। তারা সরকার গঠন করবে—এটা সবার কাছে

প্রত্যাশিত ছিল। যেকোনো গণতন্ত্রমনা মানুষের এটা কাম্য। এটা না করে পাকিস্তান সরকার যে পন্থা বেছে নিল, তা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার শামিল। ওরা বুঝতে পারেনি যে সত্যিকার অর্থে অবস্থা কী এবং দেশে কী হতে যাচ্ছে!

এর মধ্যে আমার এক ভাতিজা একদিন ফোন করে আমাকে বলল, ২২ মার্চ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক লোকদের একটি মার্চপাস্ট অর্থাৎ শোভাযাত্রা হবে বায়তুল মোকাররমের সামনে। কর্নেল ওসমানী সেখানে থাকবেন। আমি যেন উপস্থিত থাকি। আমি সেদিন সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম কর্নেল এম এ রব আছেন, জেনারেল মজিদ আছেন। আমরা তিন লাইনে দাঁড়ালাম। আমি একটা লাইনে ছিলাম। কর্নেল ওসমানী আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, 'বিমানবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ। আপনি তাদের প্রতিনিধিত্ব করুন।' এতে আমি রাজি হলাম। শোভাযাত্রা শেষ করে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে গেলাম। তাঁর সঙ্গে সেদিন আমাদের দেখা হলো।

ওখানে আমি ওসমানী সাহেবের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে, বিশেষত পাকিস্তানি বাহিনীকে মোকাবিলা করার বিষয়ে কথা বললাম। আমি ওসমানীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এ বিষয়ে কী ভাবছেন?' তাঁর কাছ থেকে কোনো সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না। আমি তাঁকে বললাম, অসহযোগ আন্দোলন দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে মোকাবিলা করা যাবে না। তাদের সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু এ-জাতীয় সামরিক পরিকল্পনা আওয়ামী লীগের ছিল কি না, এটা ওসমানী সাহেব আমাকে বলেননি।

আসলে ইতিহাসের অনেক কথা বলা বা লেখা যায় না। ঐতিহাসিক যে ঘটনা ঘটে, তা লিখিত ইতিহাসে থাকলেও ইতিহাসে যা লেখা হয়, তার সবটাই ইতিহাস নয় বা সে ঘটনা আদৌ ঘটে না। ২২ মার্চের শোভাযাত্রা শেষে আমি আমার আত্মীয় ও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি রবের বাসায় গিয়েছিলাম। সম্পর্কে তিনি আমার ভাই হতেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদসহ আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের খুব ভালোভাবে চিনতেন। সেদিন আমি রব ভাইকে বললাম, 'আপনি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে দেখছেন বা এ বিষয়ে কী ভাবছেন?' রব ভাই বললেন, 'গান্ধীও ১৯২০ সালের দিকে অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন, কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকেনি।' আমি তখন বললাম, 'আপনি গিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলুন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক।' আমি তখনই ধারণা করেছিলাম, এখানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী একটা ভয়ানক ধ্বংসলীলা চালাবে। এই ধ্বংসলীলা হবে অকল্পনীয়—হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসের মতো। আমার এই ধারণার কথাও তাঁকে বললাম। এরপর আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি দ্রুত শেখ সাহেবের সঙ্গে

দেখা করুন। দেখা করে জানার চেষ্টা করুন শেখ সাহেব কী ধরনের প্রস্তুতির কথা ভাবছেন।' রব ভাই আমাকে পরদিন সন্ধ্যায় আবার তাঁর বাসায় যেতে বললেন।

আমি পরদিন সন্ধ্যায় রব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। রব ভাই বললেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। তবে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। তিনি তাঁকে বলেছেন, 'এসব আমি জানি।' তারপর সেদিন আমি সোবহানবাগ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখা হলো এ কে এম মাহবুবুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি পাবনা থেকে এমপিএ পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি আমাকে কাছেই একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ওই বাড়ির দোতলায় উঠে দেখি ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী সাহেব বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁকে আমি চিনতাম। মনসুর আলী সাহেবের সঙ্গে ছিলেন সিরাজগঞ্জ থেকে নির্বাচিত এমপিএ হায়দার সাহেব। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমি এমপিএ হায়দার সাহেবকে বললাম, 'বঙ্গবন্ধু সব নেতাকে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় যাওয়ার কথা বলেছেন, অথচ আপনি এখনো এখানে বসে আছেন!' কেননা, আমি জানতাম, যেকোনো মুহূর্তে পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ শুরু করতে পারে। আমাদের বসে থাকার সময় নেই। মনসুর আলী সাহেবের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তাঁকেও আমি আমার মতামত জানালাম। তিনি আমাকে কিছু বললেন না। তারপর আমি চলে এলাম।

মঈদুল হাসান: ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে থেকেই পাকিস্তান তার সৈন্যবল পূর্ব পাকিস্তানে বাড়াতে শুরু করে। সেই সময় অনেকে মনে করত, একটা বিশাল রক্তপাত হতে চলেছে এখানে। এই সময়ের আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা কথা বলি। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব আসাফ-উদ দৌলার বড় ভাই মসিহ-উদ দৌলা তখন ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোর কমান্ডার অফিসে জেনারেল স্টাফ ছিলেন, কোর কমান্ডারের জি-২, ইনটেলিজেন্সের দায়িত্বে। তিনি তখন মেজর ছিলেন। ওঁদের আরেক ভাই আনিস-উদ দৌলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আনোয়ারুল আলম। তিনি আমারও ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

মার্চের ৩ তারিখে ওঁদের কাছ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি সম্পর্কে গোপন নানা তথ্য জানতে পারার পর আনোয়ারুল আলম আমার সঙ্গে দেখা করেন। তথ্যগুলো উচ্চতর রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে পৌঁছানো দরকার, তাই তথ্য সরবরাহকারী তাঁকে অনুরোধ করেছেন বলে তিনি আমাকে জানান। পাকিস্তানি আক্রমণের প্রস্তুতি এতটাই এগিয়েছে যে এর মধ্যেই রংপুর থেকে ট্যাংকবহর ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাতে রাবার বেল্ট লাগানো হচ্ছে ঢাকা শহরের পথে আক্রমণ বা তৎপরতা চালানোর উপযোগী করে। আনোয়ারুল আলম সেদিন আমাকে সংশ্লিষ্ট মহলে খবরগুলো পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি

কেবল আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুই ছিলেন না, আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও এক ছিল এবং তাঁর সততা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় আমার আস্থা ছিল। কাজেই তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি হই। তবে বলি, 'এসব খবর হয়তো অন্যভাবেও পৌঁছে যাবে, বরং আপনার সূত্রকে জিজ্ঞাসা করুন, পাকিস্তানের আসন্ন হামলা ঠেকানোর মতো কোনো উপায় আছে কি না।'

আলম পরের দুই দিন ওই কাজে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিরাট ঝুঁকি নিয়ে ওদিকে যোগাযোগ করেন অন্তত দুবার, আবার এদিকে কথা হয় অনেকবার আমার সঙ্গেও। ৫ মার্চ সন্ধ্যায় আমার জিজ্ঞাসার পুরো উত্তর পাওয়া যায়। তিনি জানালেন, পাকিস্তানি সামরিক আক্রমণের প্রস্তুতি বন্ধ করা যেতে পারে কেবল সামরিক পথেই। এখনো এই প্রদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) বাঙালি সেনার সংখ্যা অবাঙালি সেনাদের চেয়ে বেশি। তা দিয়ে গোদনাইল জ্বালানি তেলের ডিপো ধ্বংস করা, ঢাকা বিমানবন্দর অকেজো করে ফেলা এবং চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দখল করা—এই তিনটি কাজ একযোগে করা সম্ভব। এগুলো হলেই পাকিস্তানিরা খুব অসুবিধায় পড়বে।

এই কাজগুলো করার জন্য বাঙালি সৈনিকদের পাওয়া যাবে কি না এবং কীভাবে পাওয়া যাবে, এটাই ছিল আমার পরবর্তী প্রশ্ন। সেই উত্তরও আলম নিয়ে আসেন। যথেষ্ট বাঙালি সৈনিক আছে, তবে সেনাবাহিনীর লোকদের দিয়ে কিছু করাতে হলে একটা আদেশ লাগে, ওপরের বৈধ বা আইনসঙ্গত আদেশ ছাড়া তারা কিছু করতে পারে না। সেই আইনসংগত অধিকার শেখ মুজিবের এখনো নেই, তবু বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার ফলে তিনি একটা নৈতিক বৈধতা পেয়েছেন। এর ভিত্তিতে তিনি যদি পরিষ্কারভাবে একটা আদেশ দেন, তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি সৈনিকেরা অস্ত্র ধরতে রাজি হবেন, যেমন বেসামরিক প্রশাসনের সবাই তাঁকে মেনে নিয়েছেন।

একই সূত্রের কাছে গোটা প্রদেশের একটা সামগ্রিক অবস্থা জানার প্রয়োজন ছিল—উভয় পক্ষের তুলনামূলক সেনাসংখ্যা জানার জন্য। তাই একটা ম্যাপ বা নকশা আমি চেয়েছিলাম। সেটাও পাঠানো হবে বলা হয়েছিল। আলমের সঙ্গে তারপর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় মেজর মসিহ-উদ দৌলা সেই নকশা বানিয়ে তাঁর বোন প্রখ্যাত গায়িকা ফিরোজা বেগমের হাতে ৭ মার্চ সকালে সরাসরি শেখ মুজিবের কাছে পাঠিয়েছিলেন বলে অনেক বছর বাদে প্রেরকের কাছেই আমি জানতে পারি। কিন্তু সেটার তখন আর প্রয়োজন পড়েনি।

যা-ই হোক, আমি ওই দিনই অর্থাৎ ৫ মার্চ রাত সাড়ে ৯টায় গেলাম শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে আমার ১০-১১ বছরের পুরোনো পরিচয়। ১৯৬২ সালে আমি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে নিরাপত্তাবন্দী হিসেবে সাড়ে চার মাস ঢাকা কারাগারে ছিলাম, একই ২৬ সেলে। তারপর আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। ৫ মার্চ রাতে যখন তাঁর কাছে গেলাম,

তখন আওয়ামী লীগের নেতারা সদলবলে বেরিয়ে আসছেন। আবদুল মোমিন এগিয়ে এলেন আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে। তাঁকে বললাম, আমি একা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। কারণ আমি যে ব্যাপারে কথা বলতে চাই, এর সঙ্গে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত একজন কর্মকর্তার (মসিহ-উদ দৌলা) নিরাপত্তার প্রশ্ন রয়েছে। এ কথা বলার পর তিনি আর আমার সঙ্গে গেলেন না। সে সময় রেহমান সোবহানও ওখানে ছিলেন। তিনি এসব কিছু না শুনেই সোৎসাহে আমাকে ভেতরে অর্থাৎ শেখ মুজিবের কাছে নিয়ে গেলেন। তবে সে সময় রেহমান সোবহান বাংলা ভাষা ততটা ভালো বুঝতেন না। সেটাই ছিল আমার ভরসার কথা।

আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে মেজর দৌলার দেওয়া তথ্য, পাকিস্তানের হামলা বা আক্রমণ-প্রস্তুতি, ট্যাংকবহরকে ঢাকা শহরে চলাচলের জন্য প্রস্তুত করার সংবাদ, এমনকি তথ্যদাতার পারিবারিক পরিচয়ও প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলাম। আমি যা অনুমান করেছিলাম, তিনি শুনেই বললেন, 'আমি সব জানি!' আমি তাঁকে বললাম, আরও একটা সংবাদ আছে দেওয়ার। আমি ওই সূত্রকে জিজ্ঞাসা করেছি, কী করে পাকিস্তানিদের ঠেকানো যায়। উত্তরে তারা জানিয়েছেন, তিনটি সুনির্দিষ্ট কাজ করতে হবে—এক. গোদনাইল পিওএল ডিপো অকেজো করা, দুই. ঢাকা বিমানবন্দর ব্যবহারের অনুপযোগী করা, তিন. চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দখল করা। এগুলো করার মতো এখানে পর্যাপ্ত বাঙালি সৈন্যও আছে, তাদের পাওয়াও যাবে বলে শুনেছি, তবে তার জন্য আপনাকে পরিষ্কার নির্দেশ দিতে হবে। এর ফলে অন্যান্য জায়গাতেও পাকিস্তান দুর্বল হয়ে পড়বে তাড়াতাড়িই। অন্যদিকে ভারত তার দেশের ওপর দিয়ে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে এবং ঢাকা বিমানবন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর বন্ধ করে দেওয়ার পর অধিকতর জনবল ও রসদ সংগ্রহ করে এই প্রদেশে শক্তিশালী হওয়া পাকিস্তানের জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আমার সব কথা শুনে একটু চুপ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, 'তাজউদ্দীন জানে ব্যাপারটা?' আমি বললাম, 'না, কেবল আপনিই জানতে পারলেন, সেটাই ছিল তাদের অনুরোধ।' 'তাহলে আপনি তাজউদ্দীনের সঙ্গে আলাপ করে নেন', শেখ মুজিব এ কথা বলে আমার সঙ্গে আলোচনা শেষ করলেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে বেরিয়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাজউদ্দীন আহমদের বাড়িতে যাই। তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। তার পরও অনেক প্রশ্ন করে আরও বিষয় তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন। সবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুজিব ভাইয়ের কথা শুনে আপনার কী মনে হলো? তিনি কেন আপনাকে আমার কাছে পাঠালেন?' আমি বললাম, 'তিনি হয়তো এ ব্যাপারে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান না। আবার খবরটা অগ্রাহ্যও করতে পারলেন না। তাই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। দায়দায়িত্ব এখন আপনার।' তাজউদ্দীন হেসে বললেন, 'এই

তো আপনি আওয়ামী লীগের রাজনীতি বুঝে গেছেন!' এমনিভাবে ওই রকম একটি উদ্যোগের সম্ভাবনা তখন বাদ পড়ে।

আরও অনেক জানা ও অজানা ঘটনা আজও, স্বাধীনতার এত বছর পরও, পক্ষপাতহীনভাবে এবং সমগ্র ঘটনার অংশ হিসেবে দেখা হয় না। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই বহুল প্রচারিত উক্তির কথাই ধরা যাক। মার্চের প্রথম পাঁচ দিনে পূর্ববাংলার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের তীব্রতা দেখে ইয়াহিয়া অপ্রত্যাশিতভাবেই আবার ঘোষণা করেন, ২৫ মার্চ থেকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। এটা তাচ্ছিল্য করার বিষয় ছিল না। কাজেই ৭ মার্চের জনসভায় শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার শর্ত হিসেবে তিনটি দাবি তোলেন—সান্ধ্য আইন তুলে নিতে হবে, সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যা ও নির্যাতনের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তিনি এও জানতেন, এ দেশের অনেক মানুষ স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে জনসভায় এসেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি তখন সেই ঘোষণার অনুকূলে ছিল না। পর্যাপ্ত সামরিক প্রস্তুতি না নিয়ে এ ধরনের ঘোষণা বিরাট বিপদ ডেকে আনতে পারত। এই নাজুক অবস্থায় মানুষকে সংগ্রামমুখী করে রাখার উদ্দেশ্যে এবারের সংগ্রামের চরিত্র উদ্দীপ্তভাবেই তিনি তুলে ধরেন। সেই ঘোষণাকে সে সময় যেভাবেই গ্রহণ করা হয়ে থাকুক, আট দিন বাদে ঢাকায় মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা শুরু হওয়ার পর মানুষ বরং এই আলোচনার ফলাফলের দিকেই আগ্রহী হয়ে ওঠে।

পাকিস্তানি ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর শেখ মুজিবের কণ্ঠে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো স্বাধীনতার ঘোষণা না থাকায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পরবর্তী সময়ে ৭ মার্চের ঘোষণাকে প্রতিদিন কয়েকবার করে বাজানো হয়েছে। তারও অনেক বছর পর উত্তরসূরিদের রাজনীতি আবার সেই কথা দুটি সামনে এনে তা স্বাধীনতা ঘোষণার সমার্থক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যে পটভূমিতে, যে বাস্তবতা বোধ থেকে এবং যেভাবে ওই বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল, তার যথার্থতা ভাবাবেগবর্জিতভাবে এ দেশে কমই আলোচিত হয়েছে। এটা তাঁর অনুসারীরাও করেননি, বিরুদ্ধবাদীরাও না।

১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে। ছাত্রলীগের ছেলেরা আপসহীনভাবে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম জোরদার করে তুলেছিল নেতৃত্বের ওপর চাপ বাড়িয়ে। অন্যদিকে নির্বাচিত এমএনএ-রা, যাঁদের বেশির ভাগ ছিলেন নব্য আওয়ামী লীগার, তাঁরা জাতীয় পরিষদে যোগ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন, মোটামুটিভাবে সম্মানজনক আপস প্রস্তাবের ভিত্তিতে। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে নিজে অত বড় একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর, ছয় দফা দাবি কমিয়ে কোনো আপস প্রস্তাব গ্রহণ করলে, তা রাজনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর হবে বলে শেখ মুজিব মনে করতেন।

অন্যদিকে ইয়াহিয়া ছয় দফার সমর্থক সদস্যদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার বিনষ্ট করার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তা প্রতিরোধ করার জন্য সত্যি একমাত্র উপায় ছিল, মার্চের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে সংখ্যা ও সামর্থ্যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যবস্থা করা, যে পথ শেখ মুজিব গ্রহণ করেননি। একটা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে নিরস্ত্র দেশবাসীকে যত দূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কেবল সে পথে যে ক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব নয়, তা আর অস্পষ্ট থাকেনি। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কিসের ভরসায় শেখ মুজিব ১৫ মার্চ থেকে ঢাকায় ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকে বসতে সম্মত হলেন? কারা তাঁকে আস্থা জুগিয়েছিল, সেই সামরিক জান্তা, যারা এক দিনের জন্যও সৈন্য ও সমরসম্ভার নিয়ে আসা থেকে বিরত হয়নি, তারা তাঁকে স্বায়ত্তশাসন দেবে?

এখনো এসব বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত হয়নি। সম্প্রতি আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট ১৯৭১ সালের যেসব গোপন দলিলপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেছে, তার মধ্যে কিছু সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবত ২১ ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার আস্থাভাজন পাকিস্তানি আইনজীবী এ কে ব্রোহিকে শেখ মুজিব বলেন, 'আমি আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁরাই এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন।' এরপর এই অঞ্চল নিয়ে আমেরিকার তৎপরতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাদের তৎপরতার বিভিন্ন দিক—কলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অন্তর্ঘাতী তৎপরতা থেকে শুরু করে যুদ্ধের শেষ অবধি সপ্তম নৌবহরের তৎপরতার অনেক কথাই ইতিমধ্যে আমেরিকান আর্কাইভ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ২৫ মার্চের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার দুই দিন আগ পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসনের আইন তৈরির মায়াময় জগৎ সৃষ্টিতে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল কি না, তা আজও অজ্ঞাত।

স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেন একটি পরিষ্কার সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি, সেটা ভাবাবেগমুক্তভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি ছোট ঘটনার কথা বলি। ২২ মার্চ সন্ধ্যায় পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রধান আবদুল ওয়ালি খান, গাউস বক্স বেজেঞ্জো, ওদিকের এবং এদিকের আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার বাসায় নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। স্থানীয় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তি হিসেবে একমাত্র বদরুদ্দীন উমরের কথাই মনে করতে পারছি। ওয়ালি খান এসেই বললেন, আমি আজ সকালে ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করি, 'কী তোমার সর্বশেষ অবস্থা?' ইয়াহিয়া বললেন, 'আমি যেখানে এসে দাঁড়িয়ে গেছি, সেখান থেকে বেরোতে হলে, আই হ্যাভ টু শুট মাই ওয়ে থ্রু।' আমি খবরটা শেখ মুজিবকে দেওয়া দরকার মনে করে গেলাম তাঁর কাছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জানেন,

ইয়াহিয়া কী করতে পারে?' এ কথা বলতেই শেখ সাহেব বললেন, 'হি উইল হ্যাভ টু শুট হিজ ওয়ে থ্রু।' ওয়ালি বললেন, 'ইয়াহিয়া খানের কথা হুবহু শেখ মুজিবের মুখে শুনে আমি থ বনে গেলাম।' তিনি আরও বললেন, 'তাহলে ওঁদের দুজনার মধ্যে আগেই এ কথা হয়েছে।'

অন্যদিকে আমেরিকানরাও জানত। প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ১০ মার্চ ঢাকায় আমেরিকান কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড শেখ মুজিবের এক গোপন প্রতিনিধি আলমগীর রহমানকে প্রথম খবরটা জানান যে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকায় আসছেন তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য। ইয়াহিয়া ও মুজিবের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য তাঁর একটা পরিকল্পনাও আছে। আর্চার ব্লাড সে কথা স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠানো একটি প্রতিবেদনেও উল্লেখ করেন। কিন্তু সেই গোপন পরিকল্পনা আজও অবমুক্ত হয়নি। বস্তুত ১০ মার্চের পর থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ দিনের অধিকাংশ দলিলই এ পর্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায় ওই দুঃসময়ে আমেরিকার ভূমিকা কী ছিল, কীভাবে ও কাদের তারা প্রভাবিত করেছিল, সে ইতিহাস এখনো অজ্ঞাত।

দৃশ্যত ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত শেখ মুজিব তাঁর সহকর্মীদের বিভিন্ন জায়গায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন, আত্মগোপন করার কথা বলেন, কিন্তু তিনি নিজে কী করবেন বা কোথায় যাবেন, সে কথা কাউকে বলেননি। তিনি এটাও কাউকে বলে যাননি যে তাঁর অনুপস্থিতিতে কে বা কারা এই সংগ্রামের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করবেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে একটা বিষয় আমি দেখে এসেছি, যৌথ নেতৃত্ব বলে কার্যকর কিছু এদের ছিল না। সাংগঠনিক কাজকর্মে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা বলে কোনো কিছুতে তারা বিশ্বাস করেন না। যিনি নেতা, তিনিই সমস্ত ক্ষমতার এবং সকল মূল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। অন্য যাঁরা নেতা থাকেন, প্রধান নেতা তাঁদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে কাজ করেন। এর সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই থাকে। অসুবিধা হলো, যখন প্রধান নেতা উপস্থিত থাকেন না, তখন অন্য নেতারা একে অন্যের সমকক্ষ মনে করেন, এবং এর ফলে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়।

২৫ মার্চ রাতে শেখ সাহেব ধরা পড়লেন, পাকিস্তান বাহিনীর বিশাল আক্রমণে নিরীহ লোক মরতে শুরু করল, যে আক্রমণের পূর্বাভাস এক দিন আগেও কেউ দেয়নি। আওয়ামী লীগের সবাই পালিয়ে গেল, দেখাদেখি অন্য দলের লোকেরাও। তারপর আক্রান্ত উপদ্রুত সাধারণ মানুষদের সবাই নরঘাতক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে ক্রমে আশ্রয় নিল বিদেশে, প্রধানত ভারতে, অজানা পরিবেশে। বাঙালি সেনা, ইপিআর, পুলিশ-আনসাররা প্রতিরোধের লড়াইয়ে নামল। প্রবাসে সরকারও গঠিত হলো তাজউদ্দীনের বিচক্ষণতা ও একাগ্রতার ফলে। ভারত উত্তরোত্তর অধিকতর রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সমর্থন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিযুক্ত করল। সবই হলো। যেটা হলো না, সেটা সেই নেতৃত্ব-সমস্যার সমাধান।

নেতৃত্বের দায়িত্ব তো শেখ মুজিব কাউকে দিয়ে যাননি, তাহলে তাজউদ্দীন কেন? সে সময় সবাই ভেবেছেন, আমিও হতে পারি শাসনক্ষমতার প্রধানতম ব্যক্তি। এই ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন অবধি চলে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা প্রভাবিত করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব-কাঠামোকেও। যদি মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে কার্যকর শৃঙ্খলা বজায় থাকত, তাহলে তাজউদ্দীন পারতেন বাংলাদেশ বাহিনীকে অনেক সক্রিয় ও সংহত করে তুলতে, মুক্তিযুদ্ধের গতিবেগ বহুলাংশে বাড়িয়ে তুলতে। তিনি সঠিক মনোভাবই প্রকাশ করতে পারতেন, যখন জুলাই মাসে সেক্টর অধিনায়কদের বৈঠকে ওসমানীকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার দাবি উঠেছিল প্রায় সর্বসম্মতভাবে, শুধু একজন সেক্টর অধিনায়কের আপত্তি ছাড়া। এঁদের যুক্তি ছিল, ওসমানী অত্যন্ত প্রবীণ, গেরিলা যুদ্ধের রীতিনীতির সঙ্গে অনভ্যস্ত এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের ব্যাপারে অত্যন্ত অনমনীয়। তাঁকে বরং দেশরক্ষামন্ত্রীর মতো একটা সম্মানজনক পদে বসিয়ে দেওয়া হোক। যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক সব সেক্টর অধিনায়ককে নিয়ে গঠিতব্য যুদ্ধ পরিষদ বা ওয়ার কাউন্সিলের হাতে। বাংলাদেশ বাহিনীতে কর্মরত সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে এই পরিষদের প্রধান করার প্রস্তাব হয়। মেজর জিয়া এই প্রস্তাব নিয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করেও তুলেছিলেন এবং ওসমানী তা জানামাত্র পদত্যাগ করে যুগপৎ আবেগঘন ও রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেন।

তাজউদ্দীনের পেছনে যদি মন্ত্রিসভার সমর্থন থাকত, তাহলে এই প্রস্তাবকে তিনি যুক্তিসংগত বলেই মেনে নিতেন। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। তিনি জানতেন যে ওসমানী সম্পর্কে যদি কিছু বলা হয়, তাহলে সেটা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার চলবে। এই প্রচারে একদিকে থাকবে মন্ত্রিসভার তাঁর সহকর্মীরা, অন্যদিকে সবচেয়ে ব্যাপক প্রচারে অংশ নেবেন মুজিব বাহিনীর নেতারা।

এ কে খন্দকার : মঈদুল হাসান সাহেব একটা কথা বললেন যে প্রথম দিকেই যখন পাকিস্তানিরা তাদের সৈন্য-সামন্ত ও রসদ বাড়াতে আরম্ভ করল, সেই সময় আমি সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা ছিলাম ঢাকায় গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে, অর্থাৎ পূর্ণ কর্নেল, যা বেশ বড় পদ ছিল সে সময়। সে কারণে যেকোনো স্থানেই আমি যেতে পারতাম। আমি ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ থেকে দেখছি তারা সৈন্য-সামন্ত ও রসদ বাড়িয়েই যাচ্ছে এবং এই কথা আমি পাকিস্তান বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার এস আর মীর্জা, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজাকে জানাই এবং তাঁদের বলি, এই সংবাদ যেন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে জানানো হয়। আমি তাঁদের বলেছি, কীভাবে প্রতিদিন পাকিস্তান থেকে সৈন্য-সামন্ত ও কমান্ডো আসছে,

কীভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আসছে। এই সব কথাই বলার জন্য তাঁদের বলেছিলাম। তাঁরা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন বলে আমি জানি। মঈদুল হাসান সাহেব বললেন গোদনাইলের কথা। আমার স্ত্রীর বড় বোন সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন রাজনীতির বিষয়ে। তাঁর মাধ্যমেও আমি বলে পাঠিয়েছিলাম যে গোদনাইলের তেল ডিপোতে কিছু করা যায় কি না। আমি এস আর মীর্জাকেও বলেছিলাম বিষয়টি।

এস আর মীর্জা : এ কে খন্দকার সাহেব আমাকেও বলেছিলেন গোদনাইলে সরকারি তেল ডিপোতে একটা কিছু করার জন্য। এর আগে বলেছিলাম, তখন আমার এক আত্মীয় ছাত্রলীগের নেতা ছিল। আমি এই সংবাদ তখন তার এবং আরও কয়েকজনের মাধ্যমে ছাত্রলীগের নেতাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা করেছিল কী! ছোট গর্ত খুঁড়েছিল পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য, এর বেশি কিছুই তারা করতে পারেনি।

এ কে খন্দকার : আমি এস আর মীর্জাকে বলেছিলাম গোদনাইল থেকে আসার রাস্তাটা এমনভাবে কেটে বন্ধ করতে, যাতে পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে জ্বালানি তেল না আনতে পারে। তখন ভারত পিআইএ-কে অনুমতি দিচ্ছিল না সরাসরি তার দেশের ওপর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসার। ফলে শ্রীলঙ্কা হয়ে আসতে হতো পাকিস্তানি বিমানকে। যে কারণে পাকিস্তানিদের জ্বালানি তেলের প্রয়োজন বেশি ছিল। সে জন্য আমরা জ্বালানি তেল আনাটাকে যদি বাধাগ্রস্ত করতে পারি—অবশ্য একটা রাস্তা কাটলে সেটাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক করা যাবে, তবে একটা ঠিক করলে পুনরায় আরেকটা জায়গায় কাটা সম্ভব ছিল—এভাবে বারবার নাজেহাল করা গেলে পাকিস্তানিদের কিছুটা হলেও অসুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব হতো।

আমি এখানে আরেকটি কথা না বলে পারছি না, যুদ্ধের শেষ দিকে আমরা ঠিক করেছিলাম যে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী যখন কার্যক্রম শুরু করবে, তখন তাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হবে গোদনাইলের জ্বালানি তেল ডিপো এবং চট্টগ্রামের পতেঙ্গা জ্বালানি তেল ডিপো। এই দুটিকে ধ্বংস করা গেলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ জ্বালানি তেল ছাড়া তাদের চলাচল করা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ওই দুটি জ্বালানি তেল ডিপো আমাদের নবগঠিত বিমানবাহিনী এমনভাবে ধ্বংস করেছিল যে, পতেঙ্গার লোক, যারা সেদিন সেই ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছিল, তাদের জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, কী ভয়াবহ ছিল সেদিনের সেই বিমান আক্রমণ। এত বড় আগুন তারা জীবনে দেখেনি।

মঈদুল হাসান : মার্চের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি সৈন্য-সামন্ত যা ছিল, তা দিয়ে সেই সময় কী এমন আক্রমণ করা যেত বলে আপনি মনে করেন?

এ কে খন্দকার : এ সম্পর্কে অবশ্য যথাযথ উত্তর দেওয়া মুশকিল। তবে এ-জাতীয় আক্রমণ অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। আমার মনে হয়, মার্চের প্রথম দিকে যখন পাকিস্তানিদের সৈন্য-সামন্ত তেমন শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি, তখন যদি আসন্ন বিপদের কথা আঁচ করে তাদের আক্রমণের কথা চিন্তা করা হতো, তাহলে এখানে যাঁরা বাঙালি কর্মকর্তা ও সৈনিক ছিলেন, তাঁদের সবাই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতাম, তাঁরা প্রত্যেকে মনেপ্রাণে বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন। আমি তাঁদের অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছিলাম। সেই সময় আমাদের, অর্থাৎ বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে পাকিস্তান বা অন্য কিছু ভাবনার মধ্যেই ছিল না বাংলাদেশ ছাড়া। তখন যদি উদ্যোগ নেওয়া যেত, তাহলে আমাদের একটা সুযোগ ছিল তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের শক্তির বিপরীতে আমাদের শক্তি, আমাদের পুরো জনসমর্থনের দিক বিবেচনা করে গোটা ব্যাপারটি পুনর্মূল্যায়নের। এসব দিক থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম যে আগেই আঘাত কীভাবে করব বা করা যায় কি না, করলে আমাদের সম্ভাবনা কতটুকু। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে আমি বলব, আগেই আঘাত বা আক্রমণ করার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল এবং এই আঘাতে আমাদের বিজয়ের সম্ভাবনাই ছিল বেশি।

এস আর মীর্জা : আমার তো সন্দেহ হয় এই জন্য যে এটা করতে হলে প্রথমে বিষয় সম্পর্কে সবাইকে জানাতে হবে—যেখানে যেখানে বাঙালিরা আছে। এ কাজটি যদি সফলভাবে করা সম্ভব হতো এবং তারা যদি সবাই একত্রে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারত, তাহলেই কেবল এটা সম্ভব ছিল।

এ প্রসঙ্গে আমি আর একটি কথা বলতে চাই। লে. হাফিজ, যিনি প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন, তিনি ২৫ মার্চে যখন পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আক্রান্ত হন, তখন তিনি কোনো রকমে আত্মরক্ষা করে কিছু সৈনিকসহ যশোর সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁর অধিনায়ক লে. কর্নেল রেজাউল জলিল পাকিস্তান-পক্ষকেই সমর্থন দেন, মুক্তিযুদ্ধে যাননি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার বহু বছর পর আমি রেজাউল জলিলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন না। তিনি জানালেন, ২৫ মার্চের কয়েক দিন আগে মেডিকেল কোরের কর্নেল ডা. হাই ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁকে কর্নেল জলিল বলেছিলেন, 'অনুগ্রহ করে আপনি কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, আমাদের কী করা উচিত।' কর্নেল ডা. হাই যখন ফিরে গেলেন যশোরে, তখন নাকি লে. কর্নেল জলিল কর্নেল হাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে কি না। কর্নেল ডা. হাই তখন তাঁর কাছে ওসমানীর ভাষ্য জানান এভাবে : জলিলকে বলো, সে যেন কোনো হঠকারী চিন্তা বা এমন কিছু না করে। এর অর্থ কী দাঁড়াল? অর্থাৎ কর্নেল ওসমানীর

কোনো ধারণাই ছিল না কী হতে যাচ্ছে। অথবা কর্নেল ওসমানী এমন ধারণাও করতে পারেন যে একটা রাজনৈতিক সমাধান হতে যাচ্ছে।

এ কে খন্দকার : আগেই আঘাত বা আক্রমণ করা হলে কী হতো? আমি কিছু কথা বলেছি এ বিষয়ে, আরও কিছু কথা যোগ করতে চাই। আঘাত করলে কী হতো, আর কী হতে পারত—সবই তো আমরা ধারণা করছি মাত্র। তবে এটাও একটা সম্ভাবনা ছিল, যেমন চট্টগ্রামে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ছিলেন, লে. কর্নেল মাসুদ ছিলেন দ্বিতীয় বেঙ্গলে, যশোরে লে. কর্নেল রেজাউল জলিল ছিলেন—পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এমন অনেক বাঙালি কর্মকর্তা ও সৈনিক ছিলেন। নৌ ও বিমানবাহিনীতেও অনেক বাঙালি ছিলেন। তাঁরা যদি একটা রাজনৈতিক নির্দেশ পেতেন যে আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়তে হবে, তাহলে আমাদের লোকবল যে কত বেড়ে যেত, তা আজ ভাবতেও বিস্ময় জাগে। আবার এ কথাও আমি বলব যে আমরা যদি প্রথম পর্যায়েই পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, ইপিআর বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা ও সেনাদের এবং পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের একত্রে পেতাম, তাহলে আমাদের যে অপ্রস্তুত অবস্থা, বিশৃঙ্খলা-বিচ্ছিন্ন অবস্থা, সেটা থাকত না এবং আমরা আরও ভালো করতে পারতাম।

মঈদুল হাসান : আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দিতেন, তবে তার ফল বেসামরিক প্রশাসনের মতোই হতো বলে আমার ধারণা হয়েছিল। অন্তত আমার এই ধারণার কথা যুক্তি সহকারে তাজউদ্দীন আহমদকে বলেছিলাম, যাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় ১০ অথবা ১১ মার্চ। তিনি সেদিন আমার বাসায় এসেছিলেন রাতের বেলায় কিছু খবর নেওয়ার জন্য। সেই সুযোগে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আগের দিন যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তার কোনো অগ্রগতি আছে কি না।' তিনি বললেন, 'না নেই, শুধু একবার মুজিব ভাই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করেছেন কি না, আর কিছু নয়।' আমি তখন তাজউদ্দীন আহমদকে বলেছিলাম, 'আপনারা অযথা কালক্ষেপণ করছেন। বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তারা যেমন আপনাদের কথা মানছেন, বাঙালি সেনা কর্মকর্তারাও তেমনি আপনাদের কথা শুনবেন। ভারত তার দেশের ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে—এই সুযোগের দ্রুত সদ্ব্যবহার আপনাদের করা উচিত।' অবশ্য এসব কথা এখন বলে লাভ নেই। কারণ, সবই ছিল ধারণাগত বিষয়, যা তখনই যাচাই করা উচিত ছিল।

এ কে খন্দকার : রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে কথা বলা হচ্ছে, সে বিষয়ে বলতে গেলে আমার যেটুকু জানা, কেবল সেটুকুই বলতে পারি। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ

থেকে শুরু করে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সব প্রস্তুতি সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র পদক্ষেপ নিলেন না যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্ব যুদ্ধ পরিচালনা করবেন কীভাবে? যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, এমনকি তাজউদ্দীন আহমদেরও। তাঁদের কারও ধারণা ছিল না এ সম্পর্কে। প্রথম থেকে প্রায় শেষের কাছাকাছি পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব একজনের ওপর নির্ভর করে ছিল, তিনি হচ্ছেন কর্নেল ওসমানী। সত্যি কথা বলতে কি, কর্নেল ওসমানী তখন অর্থাৎ মার্চে এবং পরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমাদের সদর দপ্তরে থেকেও যুদ্ধের জন্য বস্তুত কিছুই করেননি।

মার্চের গোড়া থেকেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটা ধারণা ছিল যে কর্নেল ওসমানী আছেন, তিনিই বিষয়টি দেখবেন। কারণ তিনি তখন অত্যন্ত বড় মাপের সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু সেখানেও আমরা অত্যন্ত হতাশ হয়েছি। যাঁরা অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন—উইং কমান্ডার এস আর মীর্জা সাহেব এখানে আছেন, তিনি তো নিজেই বলেছেন যে ২২ মার্চ তাঁরা যখন কর্নেল ওসমানীর কাছে গেলেন, তখন ওসমানী তাঁদের বললেন, আপনারা শুনে রাখুন, এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যদি ট্যাংক দিয়ে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, সে ক্ষেত্রে বিদেশি হস্তক্ষেপের আশঙ্কা রয়েছে। কর্নেল ওসমানীর মতো মানুষও যখন এমন কথা বলতে পারলেন, পাকিস্তানিদের সব ধরনের প্রস্তুতি দেখেও, তখন আর কিছুই বলার থাকে না।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে শুধু এটুকু বলব, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না যে কী করা হবে, আর কী করা হবে না।

মঈদুল হাসান : এটা ঠিক যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এ রকম একটা যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা ছিল না। তাঁরা কেউ কর্নেল ওসমানীকে ডিসটার্ব করেননি। পরেও ওসমানী যে নেতৃত্ব দিতে পারবেন না, সেটাও তাঁরা জানতেন। কিন্তু ওসমানী তাঁদের একটা নোন কোয়ানটিটি—পরিচিত অংশ। যেসব সেক্টর অধিনায়ক ছিলেন, তাঁদের কাউকেই তাঁরা চিনতেন না। সেই অর্থে সেক্টর অধিনায়কেরা ততটা বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন না রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে। এমএনএ কর্নেল এম এ রব চিফ অব স্টাফ ছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সদর দপ্তরের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি আগরতলায় থাকতেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব মনে করতেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে যতই আমরা মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করি, আর যা-ই করি, শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীই আমাদের দরকার। ভারত কেন যুদ্ধে নামছে না, কেন আমাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে না—প্রথম থেকেই এসব বলে আসছিলেন আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। কাজেই তাঁরা যে কিছু জানতেন না, এ কথা আমি বলব না। আমি জানি, তাঁরা খুব জানতেন, আমাদের এই নেতৃত্ব-কাঠামো, সেনাবাহিনী—এসব দিয়ে বিশেষ কিছু

হবে না। এটা তাঁরা এপ্রিলের শেষ নাগাদই বুঝে গেছেন, যখন আমাদের সেনাসদস্যরা সব ফেলে ভারতে গিয়ে উঠেছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিশ্বাস করতেন, কাজটা ভারতকেই করতে হবে। ভারত যখন তা করতে পারত না বা চাইত না, তখন তাঁরা বুঝতে পারতেন না যে কেন ভারত পারছে না। ২৬ মার্চ যে এত বড় ঘটনা ঘটবে এবং এর বোঝা যে কত বিশাল হয়ে তাদের ওপর চেপে বসবে, তা ভারত সরকারও কল্পনা করেনি।

অন্যদিকে তাজউদ্দীন আহমদও কখনো চিন্তা করেননি তাঁকে দিল্লিতে হাজির হতে হবে আক্রান্ত দেশবাসীর জন্য সাহায্য-সহযোগিতার আবেদন নিয়ে। তাজউদ্দীন আহমদ এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। দিল্লিতে তাঁকে কেউ চিনতও না। ভারতীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টা ড. অশোক মিত্র দিল্লিতে সে সময় উপস্থিত অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক নুরুল ইসলামের কাছে জানতে চান তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে। তাঁরাই তাঁকে জানান যে তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, অসহযোগ আন্দোলনের একজন পুরোধা ও সৎ মানুষ। তাজউদ্দীনকে মিসেস গান্ধীর কাছে অবশ্য নিয়ে যান ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান কে এফ রুস্তামজী। তাজউদ্দীন আহমদকে দিল্লিতে যে বাড়িতে রাখা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি এন হাকসার কথা বলেন ওই দিন, অর্থাৎ ৩ এপ্রিল সকালে। হাকসার তাঁকে এমন একটি ইঙ্গিত দেন যে স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়া বা একটি সরকার গঠন ছাড়া ভারত কীভাবে সাহায্য করবে। এ কথা আগেও একবার আমি বলেছি।

এরপর ওই দিন রাতেই তাজউদ্দীন আহমদকে ১ সফদর জং রোডের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। তাজউদ্দীন আহমদের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি যখন পৌঁছান, তখন মিসেস গান্ধী দীর্ঘ বারান্দায় হাঁটছিলেন হনহন করে। তাঁকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম প্রশ্ন ছিল—'শেখ মুজিব কোথায়?' এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, 'শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হলেন কেন?' তাজউদ্দীন আহমদ তবু তাঁকে বলেন, 'শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, সরকার গঠন করেছেন। তারপর একটা বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন।' কিন্তু তাঁর এ কথায় ইন্দিরা গান্ধীর সংশয় কাটেনি। এর পরও সব সহযোগিতার আশ্বাস তিনি তাজউদ্দীন আহমদকে দেন। এভাবেই কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়।

দিল্লিতে আলোচনার পর ভারতের দিক থেকে বলা হয় যে তারা সীমান্ত খুলে দিয়েছে। ভারতের দিক থেকে এটা ছিল একটা বিশাল ও মৌলিক সিদ্ধান্ত। এরপর তাজউদ্দীন আহমদ কলকাতার ফিরে আসেন ৭ এপ্রিল তারিখের দিকে। এর আগে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীনের আবার দেখা হয়। তখন মূল বিষয়গুলো নিয়ে

তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। একই সময় দিল্লিতে তাজউদ্দীন আহমদের বেতার-বক্তৃতার খসড়া কপিও তৈরি হয়। এই খসড়া প্রস্তুত করেন রেহমান সোবহান ও আমীর-উল ইসলাম। তাজউদ্দীন আহমদ বক্তৃতার বিষয়গুলো দেন। ৭ এপ্রিল দিল্লিতে ওই বক্তৃতা প্রচারের জন্য টেপে ধারণও করা হয় এবং স্থির হয়, ১০ এপ্রিল তারিখে ওই বক্তৃতা ভারতীয় বেতারের কোনো এক কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার করা হবে। সেটা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নামেই করা হবে। এখানে আরও একটি বিষয় আছে, দেশের নাম কী হবে। রেহমান সোবহান বরাবরই একটা বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। তিনি প্রস্তাব করেন, যখন দেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণ বিপ্লবী ধারায় আন্দোলন শুরু করেছে, তখন এটার নাম হওয়া উচিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, অর্থাৎ পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ। রেহমান সোবহান বোধহয় কখনো এটা দাবি করেননি, কিন্তু আমি বিষয়টি জানি। তিনিই বাংলাদেশের এই নামকরণ করেন। এই নামটা এখনো চলছে। কিন্তু এই নামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কাঠামো করার কোনো রাজনৈতিক, আদর্শিক, দার্শনিক লক্ষ্য বাংলাদেশের কখনোই ছিল না।

স্বাধীনতার ঘোষণা

মঈদুল হাসান : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে, এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি।

এ কে খন্দকার : আসলে, স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে কোনো রকম আলোচনা, কিংবা দ্বিমত, কিংবা বিভাজন মুক্তিযুদ্ধের সময় কিন্তু ছিল না। এটা শুরু হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে। ২৫ মার্চ রাতে যখন পাকিস্তান বাহিনী আমাদের আক্রমণ করল, সেই রাতেই শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহলে কথা হচ্ছে, স্বাধীনতার ঘোষণাটা কীভাবে এল? ২৬ মার্চ তারিখে সারা দেশেই সান্ধ্য আইন ছিল। চট্টগ্রামে সেই সান্ধ্য আইনের মধ্যেও সেখানকার বেতারকেন্দ্রের কিছু বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে কয়েকজনের নাম আমার মনে আছে—তখন তাঁদের ঠিক কার কী পদ ছিল এখন আমার মনে নেই। তাঁরা মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে কিছু না কিছু বেতারে বলা দরকার। তখন তাঁরা সবাই মিলে একটা স্বাধীনতার ঘোষণার খসড়া তৈরি করলেন এবং সেই খসড়াটি তাঁরা ২৬ মার্চ দুপুর দুইটার সময় কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রে গিয়ে নিজেরা তা চালু করে প্রচার করেন। সেই ঘোষণা চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান পাঠ করেন। ধারণ করা এই ভাষণ সেদিন পুনরায় সাড়ে চারটা-পাঁচটার দিকে প্রচার করা হয়। তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়েছে—এমন কথাগুলো ছিল।

এদিকে বেতারকেন্দ্রটি খোলা হয়েছে এবং কার্যক্রম চালু হয়েছে, সুতরাং এটাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এ অবস্থায় তাঁরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে মেজর জিয়া নামের একজন ঊর্ধ্বতন বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সৈনিকসহ পটিয়ায় রয়েছেন।

তখন ২৭ মার্চ তারিখে সকাল ১০টার দিকে এই সব বেতারকর্মী পটিয়ায় যান। তাঁরা সেখানে গিয়ে যে আলোচনা শুরু করেন, তাতে কিন্তু ঘোষণার কোনো বিষয় ছিল না। তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন বেতারকেন্দ্রের নিরাপত্তার প্রশ্নে কথা বলতে। তাঁরা মেজর জিয়াকে বেতারকেন্দ্র রক্ষার জন্য কিছু বাঙালি সেনাসদস্য দিয়ে সাহায্য করার অনুরোধ জানান। মেজর জিয়া সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে সম্মতি দেন। এবং বলেন, 'হ্যাঁ, আমি আমার সৈনিক দিয়ে সাহায্য করব।' এরপর হঠাৎ তাঁদের কারও একজনের মনে হলো যে যদি এই ঘোষণাটি একজন সেনা কর্মকর্তাকে দিয়ে বেতারে বলানো যায়, তাহলে এর একটা প্রভাব সারা দেশে ভালোভাবে পড়বে। এই চিন্তা থেকেই মেজর জিয়াকে অনুরোধ করা হয়, তিনি এই ঘোষণাটি কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে পড়তে রাজি আছেন কি না। আমি পরে শুনেছি, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এম আর সিদ্দিকী তখন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং এম এ হান্নান সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মেজর জিয়াকে প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজি হন এবং বেশ আগ্রহের সঙ্গেই রাজি হন। মেজর জিয়া কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রে এসে প্রথম যে ঘোষণাটি দিলেন, সেটা ভুলভাবেই দিলেন। সেই ঘোষণায় তিনি নিজেকেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘোষণায় সবাই হতবাক হয়ে যান। এমন ঘোষণা তো তাঁর দেওয়ার কথা নয়! এরপর তা সংশোধন করা হয়। ঘোষণা আগে থেকেই যেটি তৈরি ছিল, সেটি আবার জিয়ার কণ্ঠে টেপে ধারণ করা হয় এবং সেটি জিয়া পড়েন ২৭ মার্চ সন্ধ্যার কিছু আগে। এভাবে বঙ্গবন্ধুর নামে এই ঘোষণাটি ২৬ মার্চ দুপুর দুইটা-আড়াইটার দিকে প্রথম পড়া হয় এবং সেদিন বিকেল চারটা-সাড়ে চারটায় তা পুনরায় প্রচার করা হয়। আর ২৭ মার্চ সন্ধ্যার কিছু আগে জিয়ার কণ্ঠে প্রথম ঘোষণা হয়। এটি হচ্ছে প্রকৃত সত্য ঘটনা।

মঈদুল হাসান: ২৫ মার্চ সন্ধ্যাবেলা, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন চলে যান এ দেশ থেকে, তখন একটা চরম সংকটপূর্ণ অবস্থার মতো হয়। সবাই ভাবতে থাকেন, তাহলে এখন কী করণীয়। এই সময় তাজউদ্দীন আহমদসহ আরও কিছু নেতা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে, অর্থাৎ শেখ মুজিবের বাড়িতে সমবেত ছিলেন। সেখানে এক ফাঁকে তাজউদ্দীন আহমদ একটি টেপ রেকর্ডার এবং ছোট্ট একটা খসড়া ঘোষণা শেখ সাহেবকে দিয়ে সেটা তাঁকে পড়তে বলেন। এ ঘটনা তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে আমার শোনা। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই আমি যখন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছি, তখন তাজউদ্দীন আহমদকে এ ব্যাপারে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ঘোষণাটা তাজউদ্দীন আহমদের নিজের লেখা। লেখাটা ছিল এমন—পাকিস্তানি সেনারা আমাদের আক্রমণ করেছে অতর্কিতভাবে। তারা সর্বত্র

দমননীতি শুরু করেছে। এই অবস্থায় আমাদের দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে। এই খসড়া ঘোষণাটা শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়ার পর সেটা তিনি পড়লেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কিছুই বললেন না, নিরুত্তর রইলেন। অনেকটা এড়িয়ে গেলেন।

তাজউদ্দীন আহমদের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি যখন তাঁকে বললেন, 'মুজিব ভাই, এটা আপনাকে বলে যেতেই হবে, কেননা কালকে কী হবে, আমাদের সবাইকে যদি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তাহলে কেউ জানবে না, কী তাদের করতে হবে। এই ঘোষণা কোনো না কোনো জায়গা থেকে কপি করে আমরা জানাব। যদি বেতার মারফত কিছু করা যায়, তাহলে সেটাই করা হবে।' শেখ সাহেব তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'এটা আমার বিরুদ্ধে একটা দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য পাকিস্তানিরা আমাকে দেশদ্রোহের জন্য বিচার করতে পারবে।' এ কথার পিঠে তাজউদ্দীন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাত সম্ভবত নয়টার পরপরই ৩২ নম্বর ছেড়ে চলে যান।

পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা আবদুল মোমিনকে। তিনি ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ছিলেন। আবদুল মোমিন আমাকে বলেন যে তিনি যখন ৩২ নম্বরে যান, তখন দেখেন যে তাজউদ্দীন আহমদ খুব রেগে ফাইলপত্র বগলে নিয়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছেন। ফাইলগুলো তিনি সব সময় সঙ্গেই রাখতেন। ঘোষণা, কর্মপরিকল্পনা এবং অন্য জরুরি কিছু কাগজপত্র এর মধ্যে থাকত। তিনি যেখানেই যেতেন, সেটা সঙ্গে নিয়ে যেতেন, কাছ ছাড়া করতেন না। তিনি যখন রেগে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন ৩২ নম্বর বাড়ির দরজার বাইরে তাজউদ্দীনের হাত ধরে আবদুল মোমিন বললেন, 'তুমি রেগে চলে যাও কেন।' তখন তাজউদ্দীন তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, 'বঙ্গবন্ধু এইটুকু ঝুঁকি নিতেও রাজি নন। অথচ আমাদের ওপর একটা আঘাত বা আক্রমণ আসছেই।'

এরপর ৩২ নম্বর থেকে তাজউদ্দীন তাঁর বাড়িতে ফিরে যান। রাত ১০টার পর কামাল হোসেন ও আমীর-উল ইসলাম যান শেখ সাহেবের বাড়িতে। শেখ সাহেব তাঁদের তৎক্ষণাৎ সরে যেতে বলেন। শেখ সাহেব নিজে কী করবেন সেটা তাঁদের বলেননি। ওঁরা দুজন যখন ওখান থেকে তাজউদ্দীন আহমদের বাড়িতে গেলেন, তখন রাত বোধহয় ১১টার মতো হয়ে গেছে। সেই সময় পাকিস্তানিদের আক্রমণ শুরু হতে যাচ্ছে। ওখানে তাঁরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাজউদ্দীনকে নিয়ে তাঁরা দুজন অন্য কোথাও যাবেন।

যাই হোক, ওই ঘোষণার খসড়া তাজউদ্দীন আহমদ ২৫ মার্চের কয়েক দিন আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন এ জন্য যে, এমন একটা অনিশ্চিত বা আকস্মিক

অবস্থা হতে পারে। তাঁর কথা আমি আমার ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলাম ১৯৭২ সালেই। তিনি বলেন, 'আমীর-উল ইসলাম ও কামাল হোসেন যখন এসে বলল যে বাড়ি থেকে এখনই সরে যাওয়া দরকার, তখন আমি ওদের বলিনি, তবে আমার মনে হয়েছিল, আমার কোথাও যাওয়া উচিত নয়।' তাজউদ্দীন আহমদ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'যেখানে আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা—যাঁকে এতবার করে বলেছি, আজকে সন্ধ্যাতেও বলেছি, তিনি কোথাও যেতে চাইলেন না এবং তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য যে সংক্ষিপ্ত একটা ঘোষণা বা বার্তা টেপ রেকর্ডে ধারণ বা ওই কাগজে স্বাক্ষর করার জন্য বলায়, তিনি বললেন, এটাতে পাকিস্তানিরা তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করতে পারবে! উনি এতটুকুও যখন করতে রাজি নন, তখন এ আন্দোলনের কী-ই বা ভবিষ্যৎ?' এদিকে আমীর-উল ইসলামদের সঙ্গে আলাপ শেষ না হতেই চারদিকের নানা শব্দ থেকে বোঝা গেল যে পাকিস্তানি সৈন্যরা সেনানিবাস থেকে বের হয়ে আক্রমণ শুরু করেছে। তারপর তাঁরা তিনজন বেরিয়ে পড়লেন। কামাল হোসেন গেলেন ধানমন্ডি ১৪ নম্বরের দিকে এক অজ্ঞাত উদ্দেশে। অন্যদিকে আমীর-উল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে তাজউদ্দীন যান লালমাটিয়ায়।

স্বাধীনতার ঘোষণার ওই যে ছোট্ট খসড়াটি তাজউদ্দীন আহমদ তৈরি করেছিলেন, ২৬ মার্চ সেটার প্রায় একই রকমের ঘোষণা দেখি, একই সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য কাগজে প্রচারিত হতে, ভারতের কাগজেও হয়েছে। সুতরাং আমি ধরে নিতে পারি, সেই সময় তাজউদ্দীন আহমদ যে খসড়া করেছিলেন, সেটা অন্য কাউকে তিনি হয়তো দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে তখন তরুণ কর্মীর কোনো অভাব ছিল না। বিশেষ করে, ছাত্রলীগের নেতৃত্ব তক্ষুনি স্বাধীনতা ঘোষণা চাইছিল। এদের মাধ্যমে যদি এটা প্রচারিত হয়ে থাকে, তাহলে আমি বিস্মিত হব না। পরবর্তীকালে, ঘটনার প্রায় এক বছর পর বলা হয়, ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার ঠিক আগে শেখ সাহেব নিজে ইপিআরের সিগন্যালসের মাধ্যমে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় খবর পাঠান। আমি যতটুকু জানি, সিগন্যালস সব সময় অত্যন্ত বিশ্বাসী লোকদের দ্বারা গঠন করা হয়। সিগন্যালসই কোনো বাহিনীর আত্মরক্ষার ও আক্রমণের মূল যোগাযোগ মাধ্যম। আর ইপিআর ছিল মিশ্র বাহিনী, এই বাহিনীতে অনেক অবাঙালিও ছিলেন। সেখানে তো তাঁদের বাদ দিয়ে সন্দেহর পাত্র বাঙালিদের হাতে সিগন্যালস থাকতে পারে না। কাজেই ইপিআর সিগন্যালসের মাধ্যমে শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন—এটা বোধহয় অবাস্তব কথা।

পরবর্তীকালে আরেকটা কথা বলা হয় যে শেখ সাহেব চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের নেতারা স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে ভারত সরকারকে খুব বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করেন, তখন স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে ভারত সরকার গুরুতর

সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা বলেন, স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো প্রমাণ, কোনো দলিল, কোনো জীবিত সাক্ষ্য আপনাদের আছে কি? ভারত সরকার বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও অন্য প্রধান নেতাদের জিজ্ঞাসা করেছে যে, কাউকে কিছু বলে গেছেন কি না শেখ মুজিবুর রহমান। এর মধ্যে জহুর আহমদ চৌধুরীও ছিলেন। প্রত্যেকেই বলেছেন, কাউকেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলে যাননি। জহুর আহমদ চৌধুরী নিজে তাজউদ্দীনকে বলেছেন, তাঁকে কিছু বলা হয়নি। স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে ১৯৭২ সাল থেকে যে দাবিগুলো করা হয়, সেটা হচ্ছে ইপিআর সিগন্যালসের মাধ্যমে তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন চট্টগ্রামে। আর তিনি যেভাবেই হোক জহুর আহমদ চৌধুরীকে সেটা পাঠিয়েছিলেন। অথচ রাত সাড়ে ১২টায় টেলিযোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে শেখ মুজিব যদি একটা ফোন করে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে, এখন যেটা শেরাটন হোটেল, সেখানে ভিড় করা যেকোনো বিদেশি সাংবাদিককে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা জানাতেন, সারা পৃথিবীতে সঙ্গে সঙ্গে তা রাষ্ট্র হয়ে যেত। যা-ই হোক, এই ইপিআর সিগন্যালসের ব্যাপারটা সম্পর্কে খন্দকার সাহেব কী জানেন, সেটা তিনি বললে ভালো হয়।

এ কে খন্দকার : আমি যতটুকু জানি, আমার স্মরণশক্তিতে যতটুকু মনে আছে, সেটুকু বলব। এই ঘোষণা-সংক্রান্ত ব্যাপারে একটু আগে যা বললাম, তার বাইরে কোনো কিছু কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আর শোনা যায়নি। কেউ চট্টগ্রামে এ-সংক্রান্ত সংবাদ পাঠিয়েছিল বা জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পাঠিয়েছিল, এমন কোনো সংবাদ সে সময় আমরা শুনিনি। এ সম্পর্কে কথা শুরু হয় স্বাধীনতার পর। এখানে একটি কথা বলব, এই যে ২৭ তারিখে মেজর জিয়াকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী, এঁরাই কিন্তু এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ সত্যগুলো আমাদের মনে রাখতেই হবে—অর্থাৎ যা ঘটেছে। এঁরাই নিজ উদ্যোগে মেজর জিয়ার কাছে গিয়েছিলেন, মেজর জিয়া তাঁদের কাছে যাননি। তবে এটা ঠিক, জিয়া তাঁদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজে এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নেননি। ২৬ মার্চ দুপুরে স্বাধীনতার ঘোষণা, এম এ হান্নান সাহেব যেটা পড়েছিলেন, এবং ২৭ মার্চ সন্ধ্যার দিকে মেজর জিয়া যেটা পড়েন, এর মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য ছিল। ২৬ মার্চেরটা অনেকে হয়তো শুনতে পাননি। কারণ সেদিন তো সবাই বিভিন্ন কারণে উদ্বিগ্ন-হতবিহ্বল ছিলেন। কিন্তু হান্নান সাহেবের কথারও একটা মূল্য ছিল, যদিও তিনি বেসামরিক লোক ছিলেন। অন্যদিকে যুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর একজন বাঙালি মেজরের কথা শোনা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। আমি নিজে জানি, যুদ্ধের সময় জানি, যুদ্ধের পরবর্তী সময়ও জানি যে মেজর জিয়ার এই ঘোষণাটি পড়ার ফলে সারা দেশের ভেতরে এবং

সীমান্তে যত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মনে সাংঘাতিক একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, হ্যাঁ, এইবার বাংলাদেশ একটা যুদ্ধে নামল। দুই ঘোষণার ব্যাপারে তফাতটা শুধু এখানেই ছিল।

মঈদুল হাসান : এটা নিয়েই বিতর্কগুলো হয়। বিতর্কগুলো এইভাবে হয়, যাঁরা জিয়ার অনুসারী তাঁরা বলেন যে, জিয়াই মুক্তিযুদ্ধের বা স্বাধীনতার ঘোষক—যেন এই ঘোষণা থেকেই মুক্তিযুদ্ধটা শুরু হয়ে গেল, আসলে তা নয়। মুক্তিযুদ্ধের পেছনে আছে লম্বা এক ইতিহাস। পূর্ববঙ্গবাসীর বঞ্চনার ইতিহাস আছে, শোষণের ইতিহাস আছে, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আছে, সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস আছে, ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস আছে। সেই সব আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নজন নেতৃত্ব দিয়েছেন। একটা সময় মওলানা ভাসানী ভীষণ সাহসী ভূমিকায় নেমেছিলেন—সেই '৫৭ সালে, যখন ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে তথাকথিত সংখ্যাসাম্যের নীতির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি নস্যাৎ করা হয়। সে রকমভাবে, '৬৬ থেকে শুরু করে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি নিয়ে একটা খুব সাহসী ও যুগান্তকারী ভূমিকায় নেমেছিলেন। তারপর ২৫-২৬ মার্চ তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পর হঠাৎ করে কোথা থেকে স্বল্পক্ষণের জন্য জিয়া, যিনি কখনো এ ব্যাপারে কোনো ঔৎসুক্য জানাননি, তাঁকে যখন চট্টগ্রাম বেতারের লোকেরা গিয়ে বলছেন যে আপনাকে বলতে হবে; তার ফলে হঠাৎ আবার নতুন উপাদান যোগ হলো আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের পক্ষে।

আমি অন্যের কথা কী বলব, মেজর জিয়ার বেতার ঘোষণা শুনে নিজে আমি মনে করেছিলাম যে, না; সত্যি তাহলে সামরিক বাহিনীর বিপুলসংখ্যক লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এটা আমার মনে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং আমি উৎসাহিত বোধ করি। আমি আশপাশে যাঁদের চিনতাম তাঁরাও এই ঘোষণায় উৎসাহিত হন। সুতরাং জিয়ার সেই সময়টুকুর সেই অবদান খাটো করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তিনিই সবকিছু করেছেন, তিনিই ঘোষণা দেওয়ার ফলে স্বাধীনতা এসেছে—সেটা তো গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে বিরাট জনসমষ্টির একটা চলমান আন্দোলনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় একেকটা সময় একেকজন নেতা এসে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। ভূমিকা কারোটা ছোট, আবার কারোটা বড়, কারোটা যুগান্তকারী—সবটা মিলিয়েই কিন্তু এই আন্দোলনটা। এটা অনেকটা রিলে রেসের মতো। শেষে যে লোকটা দৌড়ে এল, সে যদি এসে বলে যে আমি একাই এই রিলে রেসে জিতলাম—সেটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য হয় না।

১৯৬৬ সালে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ ছয় দফার আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জনের পর ১৯৭১

সালে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে অকুতোভয় দৃষ্টান্ত শেখ মুজিব স্থাপন করেন, তা আমাদের ইতিহাসে যুগান্তকারী অধ্যায়। কিন্তু ঠিক যুদ্ধ শুরু হওয়ার মুহূর্তে শত্রুপক্ষের কাছে তাঁর বন্দিত্ব মেনে নেওয়ার পর যে হত্যাযজ্ঞ ঢাকা শুরু হয়, যে বিশাল বিপর্যয় ঘটতে শুরু করে, সেখান থেকে অগণিত পলায়নপর মানুষের মধ্যে ব্যক্তি তাজউদ্দীন আহমদ জানতেন না তাঁর কী করা উচিত। ক্রমে তিনি সম্ভাবনার সূত্রগুলো একে একে খুঁজে নিতে শুরু করেন, লক্ষ্য স্থির করেন, সংগঠন গড়ে তোলেন, বিশ্বের সহায়ক শক্তিগুলোর আস্থা ও সাহায্য অর্জন করে দেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হন। তিনি কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণার বা অর্জনের বাহবার বাইরেই রয়ে গেলেন, এখনো রয়েছেন, এক অতুলনীয় কর্তব্যবোধের সম্ভ্রম নিয়ে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পেছনে লম্বা যে ইতিহাস, সে সম্পর্কে আরও একটু বলতে হয়। পাকিস্তানের প্রথম দিকে, সেই ১৯৫০ সালে বেসিক প্রিন্সিপল কমিটি (বিপিসি) রিপোর্ট তৈরির সময়, পাকিস্তানের সংবিধানের জন্য পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের যে কথাটা তোলা হয়, সেটা ছিল প্রথম অধ্যায়। তারপর ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনের সময় এই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথাটা জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে—নির্বাচনের মেনিফেস্টো ২১ দফার ২ নম্বর দফায় বলা হয় কেন্দ্রের হাতে দেশ রক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা—এই তিনটি বিষয় বাদে আর সব বিষয়ে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেটা আবার পাল্টে ফেলাও হয়, যখন ১৯৫৬ সালে সংবিধানে সংখ্যাসাম্যের নীতি অর্থাৎ প্যারিটির নীতি গৃহীত হওয়ার পর আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিচে চাপা পড়ে। এটা কিন্তু ঘটে আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নেতা এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শাসনামলেই, যিনি ছিলেন পাক-মার্কিন সামরিক জোটের উগ্র সমর্থক। আর শেখ মুজিব ছিলেন সোহরাওয়ার্দীরই একনিষ্ঠ অনুসারী।

পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিচে পড়ার পর আওয়ামী লীগের আরেক নেতা মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালে এগিয়ে এসে বললেন, 'যদি এ রকমই শোষণ ও শাসন চলতে থাকে, তাহলে আপনাদের একসময় 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে বিদায় নেব।' এর ফলে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে এবং তাঁর সঙ্গে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আর যাঁরা আওয়ামী লীগে ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সে সময় অনেক রকম অপপ্রচার ও আক্রমণ দুই-ই চালানো হয়। তাঁদের বলা হয়েছিল 'ভারতের চর'। এমনিভাবে আওয়ামী লীগ বিভক্ত হয়।

১৯৫৮ সালে আইয়ুবের সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর, যখন সব রাজনীতি বন্ধ হয়ে যায়, ১৯৬০ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত এই সময়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কিছু একনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক স্বাধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সোচ্চার থাকেন এবং নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও জনমত

গড়ে তোলেন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৫, এই দীর্ঘ আট বছরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের অবদান ছিল মুখ্য।

১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পরের বছর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করেন, এবং পুনরায় ফিরে আসেন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে। কিন্তু এই চৌদ্দ বছরে সাধারণ মানুষ বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে হয়ে ওঠে অনেক বেশি সচেতন ও বিক্ষুব্ধ। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ বড় ভূমিকা রাখে এখানকার বিচ্ছিন্ন অসহায় অবস্থা তুলে ধরতে এবং মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা দ্রুত বাড়িয়ে তুলতে। এ অবস্থার পটভূমিতে শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে যে ছয় দফা দাবি ঘোষণা করেন, তা ছিল ১৯৫৪ সালের ২১ দফার ২ নম্বর দফার মতোই। সেটা ক্রমান্বয়ে মানুষের সমর্থন সংগ্রহ করতে করতে বিপুল জোয়ারের সৃষ্টি করে। ১৯৬৮ সালে শুরু হয় বানোয়াট আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। তখন পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন পেল আর এক নতুন নেতা—শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি ছয় দফা দাবি ঘোষণার পর জেলেই ছিলেন। তারপর ১৯৬৯ সালে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর তার পরের বছর তিনি ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন করলেন। নির্বাচনে বিরাট সাফল্য পেলেন। এর কৃতিত্ব কিন্তু সম্পূর্ণই তাঁর।

এরপর স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করার বাকি কাজ সম্পন্ন করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ছয় দফার ভিত্তিতে কোনো শাসনতন্ত্র রচিত হোক, এটা তারা চায়নি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অকল্পনীয় হত্যাযজ্ঞ এক দিনের মধ্যে সর্বস্তরের মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলে। মানুষের স্বায়ত্তশাসনের রাজনৈতিক দাবি রূপান্তরিত হয় স্বাধীনতার অঙ্গীকারে। মানুষের চেতনায় এই মৌল রূপান্তরের জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর গণহত্যা একটা খুবই বড় উপাদান।

এ কে খন্দকার: স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। সত্যি বলতে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা হলো কি না, কে স্বাধীনতা ঘোষণা করল—বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু এর জন্য অপেক্ষা করে ছিল না। ২৫ মার্চ রাতে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়। কোনো ঘোষণা, কারও আবেদন বা কারও নির্দেশের জন্য বাংলাদেশের মানুষ অপেক্ষা করে ছিল না। যে মুহূর্তে তারা আক্রান্ত হয়, সেই মুহূর্তে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে—চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, জয়দেবপুর, ঢাকা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহসহ প্রায় সর্বত্রই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য ও পুলিশ তো বটেই, সাধারণ মানুষও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধে। সুতরাং কে ঘোষণা দিল, কখন দিল—এটা নিয়ে যে বিভ্রান্তি, সেই বিভ্রান্তির অবসান হওয়া উচিত। কারণ মানুষ কোনো ঘোষণার অপেক্ষায় তখন বসে থাকেনি।

মঈদুল হাসান : ২৫ মার্চ রাতে হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর আপনি কয়েক দিন ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন। ওই সময়কালে স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ে আপনি কিছু শুনেছেন কি না?

এ কে খন্দকার : আমি এ কথা একটু আগেও বলেছি যে শুধু আমার ঢাকার অবস্থানকালেই নয়, গোটা মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল ধরেই কিন্তু এই ঘোষণা নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি বা কোনো মতবিভেদ আমরা শুনিনি। আমি আগে বলেছি যে মেজর জিয়া কীভাবে এই ঘোষণাটি ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে পড়েছিলেন। যে কথাটা এখন আমি বলতে চাই তা হচ্ছে, এই ঘোষণা নিয়ে যে বিভ্রান্তি, সেই বিভ্রান্তির খুব একটা মূল্য নেই এ জন্য যে, এই ঘোষণা কখন হয়েছিল, কে দিয়েছিল, কোথায় দিয়েছিল—সেটার অপেক্ষা না করে স্বাধীনতাযুদ্ধ কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছিল ২৫ মার্চ রাতেই। তবে জিয়ার ২৭ মার্চ ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে যারা ছিল, তাদের মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

এস আর মীর্জা : আমি আগেও এ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছি। আমি এভাবে বিষয়টা দেখি—১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় আমি ঢাকায় পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দ্বিতীয় অধিনায়ক, অর্থাৎ সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলাম। ঢাকায় থেকে এই যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখনই আমার মনে তিনটি চিন্তাধারা এসেছিল। ভারতীয়রা ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আক্রমণ করেছিল; কিন্তু সেগুলো গুরুত্বহীন স্থাপনায়। যেটাকে বা যেখানে আক্রমণ করার দরকার ছিল, সেখানে তারা করেনি। অর্থাৎ তেজগাঁও বিমানবন্দর বা তেজগাঁও এলাকায় যুদ্ধকালে তারা একবারও আক্রমণ করেনি, আমরা যদিও ওদের প্ররোচিত করেছি। আমরা ওদের কালাইকুণ্ডা আক্রমণ করেছি, ব্যারাকপুর আক্রমণ করেছি এবং তাদের যথেষ্ট সম্পদ ধ্বংস করেছি। কিন্তু তার পরও তারা তেজগাঁও বিমানবন্দর বা এর অবতরণ-উড্ডয়ন ক্ষেত্র, যেটাকে আমরা রানওয়ে বলি, সেখানে একবারের জন্যও আক্রমণ করেনি। ভারতীয় সেনাবাহিনীও পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম বা আক্রমণ করার চেষ্টা করেনি। এই সব ঘটনা আমাকে তখন চিন্তিত করল যে কারণটা কী? তখন আমি তিনটি সিদ্ধান্তে এলাম। একটা হলো—তারা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। দুই. পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে কি না—এই প্রশ্নও তারা হয়তো বিবেচনা করে দেখছে। তৃতীয়ত, যদি আমাদের যুদ্ধ করে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, তাহলে ভারত আমাদের সাহায্য করবে। এটা আমি এক শ ভাগ নিশ্চিত ছিলাম এবং এ জন্যই ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আকাশ, স্থল বা নৌ—কোনো পথেই তারা আক্রমণ করেনি গুরুত্বসহকারে।

তবে এই যে আন্দোলন শুরু হলো একাত্তরের মার্চে, তখন কিন্তু আমি শুরুতেই এই আন্দোলনে যোগ দিইনি। যখন ২ মার্চ আমার ভগ্নিপতি এ কে খন্দকার, যিনি ১৯৬৯ সালে আমি অবসর গ্রহণ করার পর আমার পদেই এসেছিলেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে ঢাকায়, তিনি ওই দিন আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'দাদাভাই, পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা পাকিস্তানিরা আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না।' তারপর তিনি আরও বললেন, '১২টা ট্যাংক তারা ইতিমধ্যে নিয়ে এসেছে কুর্মিটোলায়, সেগুলো কাপড় ও গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে লুকিয়ে রেখেছে।' তিনি আরও বললেন, 'আপনি একটু দেখেন যে আওয়ামী লীগের কোনো সামরিক পরিকল্পনা আছে কি না।' তখন থেকেই আমি অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন ছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'দিন তিনেক সময় দিন, আমি এ ব্যাপারে খবর জেনে আপনাকে জানাব।'

আগেও বোধহয় বলেছি, ঢাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় নেতাদের আমি চিনতাম না। তবে ছাত্রলীগে আমার যে আত্মীয় ছিল, আমি ওর মাধ্যমে যোগাযোগ করি। তার কথাও আগে বলেছি। তারপর রব ভাই, তিনি আমার আত্মীয় এবং পাকিস্তানের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি ছিলেন, তাঁর কথাও বলেছি যে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের নেতাদের ভালো করে চিনতেন। তাঁদের মাধ্যমে যে খবর পেলাম, তাতে বুঝতে পারলাম যে আওয়ামী লীগের কোনো সামরিক প্রস্তুতি নেই, যেটা আমরা বুঝি সামরিক বাহিনীর লোক হিসেবে। বাঁশের লাঠি ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দিলেন, সেখানে তিনি সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তিনি স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য বাঙালিদের সংগ্রামে নামতে বলেছিলেন। যুদ্ধ করতে বলেছিলেন।

বলা হয়, ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে এম এ হান্নান সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে পাঠ করেছিলেন। কিন্তু সেটা আমি শুনিনি। তখন যেকোনো সময় ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে পারে আশঙ্কা করে আমি সেনানিবাস এলাকা থেকে দূরে থাকা শুরু করি। মার্চের মাঝামাঝি থেকে শ্যামলীতে আমার স্ত্রীর বড় ভাইয়ের বাড়িতে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম। ২৫ মার্চের পর আমি সব সময় রেডিও সঙ্গে রেখেছিলাম। সেটা বেশির ভাগ সময় আমি খোলা রাখতাম। ২৭ মার্চ বিকেলে পরিষ্কার শুনলাম, বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। এই ঘোষণা শুনে আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এই ভেবে যে, হ্যাঁ, এখন মানুষ স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কারণ তাদের সঙ্গে বাঙালি সেনারাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। মানুষ পাকিস্তানি হামলার কথা আগেই জেনেছিল। কিন্তু এই ঘোষণার ফলে বিষয়টি সব স্তরে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, সবাই ঘটনা জানতে পারে। ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা অনেক লোককে মেরেছে। কিন্তু

প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক স্থানেই এ খবর জানত না। এই ঘোষণা মারফত সবাই জানতে পারে এবং তারা বিদ্রোহ করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে কোনো আলোচনা বা বিতর্ক আমি শুনিনি। এ বিতর্ক শুরু হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক পরে।

শেখ মুজিব যত দিন বেঁচে ছিলেন, তত দিন এ নিয়ে কোনো কথা কেউ উত্থাপন করেননি বা বিতর্ক হয়নি। এমনকি জিয়াউর রহমানের শাসনকালেও এ ব্যাপারে কথা ওঠেনি। এটা শুরু হলো সম্ভবত ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর কয়েক বছর পর। ১৯৯১ সালে বিএনপি নতুন করে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ জিয়াকে খাটো করার চেষ্টা করে। এর পর থেকেই বিবাদটা প্রকট আকার ধারণ করল।

সশস্ত্র লড়াই

মঈদুল হাসান : ২৫ মার্চের পরে আপনি (এ কে খন্দকার) কখন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান?

এ কে খন্দকার : আমি ১৫ মে সীমান্ত অতিক্রম করে সকাল ১০টায় গিয়ে পৌঁছাই মতিনগরে। আমরা কয়েকটা পরিবার একসঙ্গে যাই। ওখানে প্রথমেই আমাদের দেখা হয় কয়েকজনের সঙ্গে এবং যতদূর নাম মনে পড়ে, ক্যাপ্টেন মাহবুবের সঙ্গে। একই সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কিছু কর্মকর্তার সঙ্গেও দেখা হয়। তাঁরা আমাদের জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের নাম কী, আমরা কী করি, আমাদের সঙ্গে কোনো অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না। আমরা কেউ সেদিন আমাদের সত্যিকার পরিচয় দিইনি। ওখানে আমরা আমাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলাম। আমরা যে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর লোক, এ কথাও সেদিন বলিনি। তারপর সেখানে বাংলাদেশের যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সাহায্যে ডাকবাংলোর মতো একটা জায়গায় আমরা আশ্রয় পাই। যে কটা পরিবার আমরা ছিলাম, সবাই সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করি। আমার সঙ্গে ছিলেন উইং কমান্ডার এম কে বাসারের পরিবার, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজার পরিবার, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম এবং আমার পরিবার। সেদিন ওখানকার মুক্তিফৌজের সদর দপ্তরের মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। অন্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল, এমনকি কর্নেল এম এ রবের সঙ্গেও আমরা দেখা করি।

তারপর আমাদের থাকতে দেওয়া হলো ডাকবাংলোর মতো একটা জায়গায়। আমরা সবাই সেখানে ছিলাম। পরদিন খুব ভোরে হঠাৎ আমি জানতে পারি যে আমাকে কেউ খোঁজ করছে। একজন এসে বললেন, আমাকে বিমানে করে তখনই কলকাতায় যেতে হবে জেনারেল কালকাৎ সিংয়ের সঙ্গে। এ অবস্থায় আমি

তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে গেলাম—জেনারেল কালকাৎ সিং, আমি আর ক্যাপ্টেন সাফায়েত জামিল। একটি ডিসি থ্রি বিমানে আমরা তিনজনই শুধু ছিলাম। সন্ধ্যা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমরা কলকাতা বিমানবন্দরে গিয়ে পৌঁছালাম। সেখান থেকে আমি আর সাফায়েত জামিল একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করি। এখানে একটি কথা বলা দরকার, হোটেলে আমরা একটি ছোট কক্ষ পেয়েছিলাম। সাফায়েত জামিল বয়সে আমার ছোট, পদবিও ছোট। সে আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। সে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে বলল, 'স্যার, আপনি খাটে থাকেন, আমি নিচে থাকি।' এভাবেই সে নিচে থাকল।

পরদিন সকালে আমরা বালিগঞ্জে, যেখানে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীরা থাকতেন, ওখানে কর্নেল ওসমানীও ছিলেন, সেখানে গেলাম। ওখানে আমি কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে থাকলাম। কলকাতায় দুই দিন থাকার পর কর্নেল ওসমানী আমাকে বললেন যে আমাকে দিল্লি যেতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে সেখানে আলোচনা হবে। দিল্লিতে আমার সঙ্গে গেলেন ভারতের গ্রুপ ক্যাপ্টেন বাদামি বলে একজন, তিনি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের লোক ছিলেন; সেটা অবশ্য আমি পরে বুঝতে পারি। এটা তিনি তখন আমাকে বলেননি, আমিও জোর করে জানতে চাইনি। দিল্লিতে গিয়ে আমরা একটা বাসায় উঠলাম। সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে আমার আলাপ হলো। তারপর অশোক রায় নামে একজনের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পারলাম, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অশোক রায়ের সঙ্গে বিদেশি সাহায্য এবং তারা কতটা সাহায্য করতে পারে, এ বিষয়ে আমার আলোচনা হয়েছিল।

দিল্লিতে আলাপ-আলোচনার আরও কয়েকটি দিক ছিল। একটি হলো, আমি সত্যি যুদ্ধ করতে এসেছি কি না, নাকি আমি পাকিস্তানের চর বা অন্যের চর হয়ে গিয়েছি, এটা জানা। দ্বিতীয়ত, আমার কাছ থেকে পাকিস্তান সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব তারা জানার চেষ্টা করল—এটাও স্বাভাবিক। তৃতীয়ত, এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে কী কী করা সম্ভব। এখানে একটি কথা বলে রাখি—উইং কমান্ডার বাসার ও সুলতান মাহমুদ—এঁদেরও একই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় অন্যত্র। এটা করা হলো আমাদের যাচাই-বাছাই করা, অর্থাৎ আমাদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি পরীক্ষা এবং গোয়েন্দাবিষয়ক সংবাদ গ্রহণের জন্য। আমি এই সময় ১৮ মে থেকে চার-পাঁচ দিন দিল্লিতে ছিলাম। পরে দিল্লিতে এম কে বাসার, সুলতান মাহমুদ আমার সঙ্গে যোগ দেন। তারপর আমরা ওখান থেকে একত্রে আগরতলা যাই। সেখান থেকে আমি আমার পরিবারসহ কলকাতায় আসি। উইং কমান্ডার বাসারও তাঁর পরিবারসহ আমাদের সঙ্গে আসেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন বাদামিও আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

সেই সময় একটা বিষয় আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে তখন পর্যন্ত ভারত সরকার নির্দিষ্টভাবে কী করতে যাচ্ছে, কী করতে পারে বা কী করবে—এই সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত তাদের নেওয়া হয়নি। তবে একটা বিষয় বুঝতে পারছিলাম, বাংলাদেশের ব্যাপারটা তাদের জন্য একটা সুযোগ, আরেকটা সুযোগ হলো বাংলাদেশের মানুষের একটা দেশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা—দুটো সুযোগই একটা জায়গায় এসে মিলেছে। এই সুযোগটা ছাড়ার কোনো প্রশ্ন আসে না। যদিও তারা কী করবে, বাংলাদেশকে কীভাবে সাহায্য করবে, কীভাবে তারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, সে ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল না। তবে আমার ধারণা হয়েছিল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করা এবং বাংলাদেশ যাতে স্বাধীন হয়, সে সম্পর্কে বোধহয় একটা অলিখিত কিংবা বেসরকারি সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল।

সেখানে আমার দেখা হয়েছিল ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কয়েকজন ব্রিগেডিয়ার এবং একজন মেজর জেনারেলের সঙ্গে। এখন তাঁদের সবার নাম আমার মনে নেই। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত জানা সম্ভব ছিল না। যেহেতু তাঁরা সবাই গোয়েন্দা বিভাগের লোক ছিলেন। তার পরও তখন আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে ভারত সরকার এমন একটা পদক্ষেপ নেবে, যাতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। আর পাকিস্তান যাতে ভবিষ্যতে বড় শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে না পারে বা তাদের জন্য বড় ধরনের হুমকি হতে না পারে, এ সুযোগটা ভারত গ্রহণ করবে, যে সুযোগটা তারা পেয়েছে।

এখানে আরেকটি কথা বলে নিই। দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর কলকাতায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান—তাঁদের সবার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তাঁদের বলেছি যে ভারত কতখানি সাহায্য করবে, কী হতে যাচ্ছে, সেটা ঠিক হয়নি। তাঁদের আমি বলেছিলাম যে আমাদের কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গতানুগতিক বা প্রথাগত প্রচলিত যুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়, আমাদের একটা গেরিলা ধরনের যুদ্ধেই যেতে হবে। এই আলোচনায় আমি তাঁদের আরও বলেছিলাম, কোনো পর্যায়ে যদি আমরা বিমান ব্যবহার করতে পারি, সেটা আমাদের যথেষ্ট কাজে লাগবে। কিন্তু সেটা কখন সম্ভব, তা এখনই বলা যাবে না। এটা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। তবে গেরিলা যুদ্ধের জন্য আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

কলকাতায় কথা প্রসঙ্গে প্রশিক্ষণ, গেরিলা যোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনের কথা ওঠে। আলোচনায় স্থির হয়, শুধু আওয়ামী লীগের এমএনএ-এমপি—এঁরা আওয়ামী লীগের যুবকদের এ জন্য নির্বাচন করবে। আমি তখন পরিষ্কারভাবে কর্নেল ওসমানীকে একটা কথা বলেছিলাম, 'স্যার, এটা অত্যন্ত ভুল হবে। কারণ বহু যুবক, বহু সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ভারতে এসেছেন।

তাঁরা রাজনীতি করেন না। আমি নিজেও আওয়ামী লীগ করি না। সুতরাং এই যে যাঁরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য এসেছেন, তাঁদের যুদ্ধে না নেওয়াটা হবে অত্যন্ত অন্যায়। এটা যুদ্ধকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সুতরাং আমি আপনাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি, বিষয়টি যেন মন্ত্রিসভায় তোলা হয় এবং অত্যন্ত জরুরিভাবে যেন এটা বিবেচনা করা হয়।' কিন্তু তিনি তখন বললেন, 'না, এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে—মন্ত্রিপরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এটাই বাংলাদেশ সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।'

এখানে প্রাসঙ্গিক নয় তবু আমার সেই সময়ের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। সেটা হলো, কলকাতায় গিয়ে একটা বিষয় জানতে আমার আগ্রহ হয়েছিল যে ওখানকার মানুষের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কী রকম আবেগ, এরা এ বিষয়ে কী ভাবছে, কোনো প্রকার দেয়াললিখন কিংবা পোস্টার আছে কি না। তখন আমি সত্যি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দেয়ালে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সমর্থনের কথা এত লেখা আছে, তাতে আমার ধারণা হলো—সারা ভারতের কথা বলতে পারি না, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বভাবত মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করছে।

যা-ই হোক, ভারতে গিয়ে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে ১৭ মে তারিখ আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। প্রথম দিন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খুব বেশি একটা কথা তাঁর সঙ্গে হয়নি। তবে আমার মনে হয়েছিল, তিনিও চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে। আমার সঙ্গে তাঁর বহুদিনের জানাশোনা ছিল। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। তিনি আমাকে বিশ্বাস করতেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি আমাকে গ্রহণ করেছেন।

আমি সামরিক বাহিনীর লোক, বিদেশের মাটিতে এসেছি, বিদেশি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতে হবে। এটা যাচাই-বাছাই হওয়া ছিল স্বাভাবিক। মূলত এই জন্যই আমাকে দিল্লি যেতে হয়েছিল। তবে সঙ্গে আরও একটি বিষয় জেনেছিলাম, সেটা হলো, পাকিস্তান সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণা, আমরা কী চিন্তা করছি ইত্যাদি জেনে নেওয়া। আমি একটু আগেও বলেছি, ভারতীয়দের কথাবার্তার মাধ্যমে বুঝেছি ভারত সরকার পরিষ্কার সিদ্ধান্ত না নিলেও তাদের সামনে যে একটু সুযোগ আসছে, পাকিস্তানকে চিরদিনের জন্য তার অবস্থান থেকে নিচে সরিয়ে নিয়ে আসার, এই সুযোগটা তারা হারানোর পক্ষে ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশকে সাহায্য করার যে একটা মানবিক কারণ তাদের ছিল, সেটাও আমি বুঝতে পেরেছি।

দিল্লি যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গেও আমার আলাদাভাবে কথাবার্তা হয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদকেও আমি একই কথা বলেছি

যে আমাদের প্রথম দিকে গেরিলা যুদ্ধই চালাতে হবে। কারণ সম্মুখযুদ্ধ চালানোর মতো জনবল, প্রশিক্ষণ. অস্ত্র আমাদের নেই। সুতরাং এগুলো ছাড়া যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী খুবই প্রশিক্ষিত, তাদের সঙ্গে এগুলো ছাড়া যুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। তাজউদ্দীন আহমদ সেটা জানতেন এবং তিনিও আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন।

দিল্লি থেকে আগরতলা হয়ে কলকাতায় আসার পর লিটন হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রুপ ক্যাপ্টেন বাদামিই থাকার এই ব্যবস্থা করেন। এরপর আমি প্রতিদিন সকালে ৮ থিয়েটার রোডে যেতাম। কর্নেল ওসমানী চাইতেন আমি যেন নিয়মিত সেখানে যাই এবং তাঁর সঙ্গে বসি। এ সময় সবার মধ্যে একটা অনিশ্চিত ভাব ছিল যে কী হতে যাচ্ছে! ভারত আমাদের কেন অস্ত্র দিচ্ছে না। কর্নেল ওসমানী নিজে বলতেন যে তাঁর বিশ্বাস, ইন্দিরা গান্ধী আমাদের সাহায্য করবেন—এটা তাঁর ধারণা ছিল। তার পরও যেহেতু আমরা পাচ্ছি না, সবার মধ্যে, এমনকি কর্নেল ওসমানীর মধ্যেও, তখন একটা হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল।

এ অবস্থার মধ্যেই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে। আমার যতদূর মনে হয়, প্রথম পর্যায়ে হাজার দুয়েক যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল তিন সপ্তাহের। প্রথম দল বেরিয়ে আসে জুন মাসের মাঝামাঝি। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক, যোগযোগের অভাবেই হোক বা স্থানীয় কারণে, কিংবা ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের কারণে, প্রথম প্রথম দেশের ভেতরে যে গেরিলা দল পাঠানো হয়েছিল, সেটা খারাপভাবে হয়েছিল। কারণ তাদের দশজনের একটি দলকে দেওয়া হতো একটি পিস্তল এবং দশটি গ্রেনেড। এগুলো দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের ধারেকাছে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। এবং প্রথম দিকে যারা দেশের অভ্যন্তরে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই আর ফিরে আসেনি।

এর ফলে আমাদের নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ও অন্য আরও অনেকের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মধ্যে ভারত-বিদ্বেষী যে একটা মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল, এটা তার জন্য দায়ী। বাংলাদেশের সেক্টর অধিনায়কেরা কিছুই জানেন না অথচ গেরিলারা ভেতরে যাচ্ছে এবং খারাপভাবে নিহত হচ্ছে। সব থিতিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সেক্টর অধিনায়কেরা, সেনা কর্মকর্তারা এবং সদর দপ্তরের আমরা সবাই এর জন্য নিরাশ, হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছিলাম যে কেন এই রকম হবে। এর জন্য একটা সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটা করা হয়নি।

দেশের ভেতরে আমরা ব্যাপকভাবে না হলেও গোয়েন্দা ও অন্য নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহের কিছু ব্যবস্থা করেছিলাম, সেখান থেকে আমাদের কাছে কিছু খবর আসত। অস্ত্রের ব্যাপারটা আমি নিজে কিছুটা বুঝতাম। দশজনের একটা দল একটা পিস্তল আর দশটা গ্রেনেড দিয়ে কী করবে? তাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব

নয়। এগুলো হয় তারা পুকুরে ফেলে মাছ মারত, নয় যেখানে-সেখানে ফেলে পালিয়ে যেত। এর ফলে পরে গ্রামবাসীর ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার হতো। এ অবস্থায় গ্রামবাসী প্রথম প্রথম মুক্তিবাহিনীকে যে আশ্রয় ও সাহায্য দিত, তা কমে গিয়েছিল। এমনকি কিছু জায়গায় আত্মরক্ষার কারণে তারা বিপরীত দিকে চলে গিয়েছিল। এ কারণে বিশেষ করে জুন-জুলাই—এই দুটো মাসে গেরিলাযোদ্ধারা দেশের ভেতর সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এই সব কারণে কিছু জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে জনমত গড়ে উঠেছিল। তবে এটা যে সব জায়গায় হয়েছে তা নয়, কিছু জায়গায় গেরিলা যোদ্ধারা বীরত্বের পরিচয়ও দিয়েছে। যেসব জায়গায় তারা এটা করতে পেরেছে, সেসব জায়গায় আমরা স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য-সহানুভূতি পেয়েছি। জুন-জুলাই মাস, এমনকি আগস্টের প্রথম পর্যন্ত এ অবস্থা চলেছে।

এস আর মীর্জা : আমি এ কে খন্দকারের আগেই ঠাকুরগাঁও সীমান্ত দিয়ে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুরে পৌঁছাই। ওখানেই আমাদের এলাকার আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে আমাকে থানায় হাজিরা দিতে হয় এবং তারা আমার নামধাম সব লিখে নেয়। ওই এলাকায় আমার বেশ কিছু আত্মীয় ছিলেন। আমার বড় মামা থাকতেন জলপাইগুড়ি জেলার চামসিতে। এই জায়গাটা ছিল ভুটান সীমান্তের কাছে। তিনি আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। বড় মামার বাড়িতে আমার পরিবারের সদস্যদের রেখে আমি ইসলামপুরে ফিরে আসি। এখানে একটি কথা বলে রাখি, পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। অন্যান্য অঞ্চলের কথা আমি বলতে পারি না। আমি যখন যাই, তখন বহু মানুষ ভারতের পথে যাত্রা করেছে। ভারত সরকার নির্দেশ দিয়েছে সীমান্তবর্তী জেলা ও মহকুমায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করার। আমাকে আশ্রয় দেওয়া হয় একটা বিদ্যালয়ে। তখন ওখানকার সব বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ১৫ এপ্রিল তারিখে যাই। তার আগে অবশ্য অনেক কিছু ঘটে গেছে।

এদিকে ইসলামপুরে থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের লোকেরা আমাকে বলল যে আপনি কলকাতা যান, আপনি সামরিক বাহিনীর লোক। আমি জানতাম যে যুদ্ধ সংঘটিত হবেই। ১১ এপ্রিল তারিখেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে যারা যুদ্ধে যোগ দিতে চান, তারা যেন নিকটস্থ আওয়ামী লীগ সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এটা তাজউদ্দীন সাহেব ঘোষণা করেছিলেন। আমি সে ঘোষণা অনুযায়ী তাঁদের কাছে গিয়েছিলাম। যা-ই হোক, তারপর আমি ইসলামপুর স্টেশন থেকে রেলে করে কলকাতা গেলাম। ২৫ এপ্রিল গিয়ে পৌঁছাই কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে। আমি আওয়ামী লীগ নেতা প্রফেসর ইউসুফ আলীকে চিনতাম। তিনি দিনাজপুরের লোক। কর্নেল ওসমানীকে চিনতাম। কলকাতায় গিয়ে জানতে পারি,

তাঁরা পশ্চিম বাংলার এমপি হোস্টেলে অবস্থান করছেন। আমি ওখানে গেলাম। সেখানে একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো। আমি আমার পরিচয় বলার পর তিনিও নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, তাঁর নাম সোহরাব হোসেন, যশোর এলাকার নির্বাচিত এমপি। আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, কর্নেল ওসমানী বা অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব কোথায়। তিনি জানালেন যে কর্নেল ওসমানী শিলিগুড়ির দিকে গেছেন। প্রফেসর ইউসুফ আলী সাহেব—তিনিও গেছেন তেঁতুলিয়ার দিকে। এমপি সোহরাব সাহেবের সঙ্গে কথা বলার সময় সেখানে একজন এলেন। তাঁকে দেখে মনে হলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ একজন। তিনি জানতে চাইলেন আমি কে। আমি আমার পরিচয় দিয়ে বললাম যে আমি যুদ্ধে যেতে চাই। তিনি বললেন, 'আপনি বসুন। আমি বাইরে যাচ্ছি, ফিরে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলব।' আমি ওখানে বসে থাকলাম। কিন্তু দেখি তাঁর আর খোঁজ নেই। তারপর অনেক পরে প্রায় বেলা তিনটার দিকে তিনি ফিরে এলেন। তখন জানতে পারলাম, তাঁর নাম সিরাজুল আলম খান। তিনি তখন একজন জনপ্রিয় ছাত্রনেতা। তিনি আমাকে বললেন, 'কর্নেল ওসমানী না হলে তো হবে না। তাঁর ফিরতে কয়েক দিন দেরি হবে। আপনি বরং ইসলামপুরেই চলে যান। সেখানে অপেক্ষা করেন। কর্নেল ওসমানী এলেই আপনাকে খবর দেওয়া হবে।' আমি বললাম, 'আমি একটা চিঠি লিখে রেখে যাই।' সিরাজুল আলম খান বললেন, 'এটার দরকার নেই। এখন তো আপনাদের মতো মানুষেরই দরকার।' তারপর আমি ইসলামপুরে ফিরে যাই। তারপর অনেক দিন চলে গেল, দেখি কোনো খবর নেই। তখন আবার মে মাসের শেষ দিকে কলকাতায় গেলাম।

কলকাতায় যাওয়ার আগে আমি খোঁজ নিয়েছিলাম এ কে খন্দকার ভারতে এসেছেন কি না। আমি মনে করেছিলাম যে তিনি এপ্রিল মাসেই ঢাকা ছেড়ে ভারতে পৌঁছেছেন। সেই সময় আমি সীমান্ত এলাকায় বারবার গিয়েছি এ কে খন্দকারের খোঁজে। কিন্তু ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীসহ অন্য কেউ তাঁর খবর দিতে পারেনি। ফলে খুবই চিন্তায় ছিলাম তাঁর ব্যাপারে। কারণ তিনি তখন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ঢাকা ঘাঁটির দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং আমি জানতাম যে তিনি পাকিস্তানপক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কলকাতায় গিয়ে থিয়েটার রোডে রিপোর্ট করার পর শুনলাম যে তিনি মে মাসের মাঝামাঝি ভারতে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কয়েক দিন পর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সেখানকার এমপি হোস্টেলে ঢুকছি, তখনই দেখা হলো এ কে খন্দকারের সঙ্গে। এর আগে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গেও আমার দেখা হয়। ওসমানী আমাকে কলকাতায় থাকতে বললেন। তাঁর কথামতো আমি সেখানে থেকে নিয়মিত বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরে যাওয়া-আসা করতে থাকি।

এই সময় একদিন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল কাজী নূরুজ্জামানের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি ১৯৫৬ সাল থেকে তাঁকে চিনতাম। তিনি আমাকে জানালেন যে তাঁকে ৭ নম্বর সেক্টর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হচ্ছে, কিন্তু তিনি ওই এলাকাটা ভালো চেনেন না। ওই সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন মেজর নজমুল হক। তিনি এক সড়ক দুর্ঘটনায় কয়েক দিন আগে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর দায়িত্ব পান কর্নেল জামান। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে ৭ নম্বর সেক্টর এলাকায় যাওয়ার জন্য। কারণ আমি ছিলাম দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও এলাকার মানুষ। আমি ওই এলাকা যেমন চিনতাম, তেমনি ওই এলাকার রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রনেতাদেরও চিনতাম। আর কর্নেল জামানের আদি নিবাস ছিল পশ্চিম বাংলায়। এদিকে তখন পর্যন্ত আমাকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এ কারণে আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানালাম এবং দু-এক দিন পর আমরা একটি জিপে করে কলকাতা থেকে রওনা হলাম দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও এলাকার দিকে।

৬ নম্বর সেক্টর এলাকা, অর্থাৎ রংপুর এলাকার দায়িত্বে ছিলেন উইং কমান্ডার এম কে বাশার। তাঁর সেক্টর সদর দপ্তর তখন ছিল তেঁতুলিয়ায়। আমরা তেঁতুলিয়া থেকে শুরু করলাম। তেঁতুলিয়া ঘুরে সেখান থেকে যাই ইসলামপুরে। ইসলামপুরে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের আওয়ামী লীগ নেতা, এমএনএ, এমপিরা ছিলেন। আমি সীমান্ত অতিক্রম করে প্রথমে ইসলামপুরে তাঁদের সঙ্গেই ছিলাম। তাঁদের সবাইকে আমি চিনতাম। এ কথা আগেও বলেছি। সেদিন ইসলামপুরে আমরা সন্ধ্যায় পৌঁছাই। আমার ছোট ভাইও আমার সঙ্গেই সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। সে ওখানেই ছিল। সেদিন প্রথমে তার এবং আরেক ছেলে, সে আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু ছিল, তার খোঁজ করলাম। তাদের সঙ্গে দেখা হলো। দেখলাম যে তারা খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে। ওরা দুজন বলল যে একজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের অধীনে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তাদের নাকি কতগুলো নিরীহ মানুষকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অথচ ওই লোকগুলো পাকিস্তানিদের সঙ্গে ছিল না বা বাংলাদেশ-বিরোধী কোনো কাজও করেনি। ওই ক্যাপ্টেনের নির্দেশে লোকগুলোকে হত্যা করা হয় এবং একই সঙ্গে লুটতরাজও চালানো হয়। সে কারণে আমার ভাই এবং তার বন্ধুটি ক্ষুব্ধ। তারা জানালো, বাংলাদেশের নিরীহ লোকদের মারার জন্য তারা যুদ্ধে আসেনি। সে কারণে তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে এসেছে। এ ঘটনা জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে ঘটে।

এরপর আমরা ইসলামপুর থেকে রায়গঞ্জ এবং সেখান থেকে হাকিমপুর গেলাম। পশ্চিম দিনাজপুরের সাব-সেক্টর ছিল এটি। বিকেলে সেখানে পৌঁছে দেখা হলো ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দীনের সঙ্গে। এই এলাকা থেকে মেজর সাফায়েত জামিল সেই মুহূর্তে চলে গেছেন জিয়ার সঙ্গে কাজ করার জন্য। হাকিমপুর গিয়ে শুনলাম

আরেক কাহিনী। ভারতীয় এক উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা আমাদের ৩০ জন গেরিলা যোদ্ধাকে—যাঁদের ভালো প্রশিক্ষণও ছিল না—কেবল হ্যান্ড-গ্রেনেড দিয়ে বগুড়ায় পাঠিয়েছেন আক্রমণ তৎপরতা চালানোর জন্য। ক্যাপ্টেন গিয়াস বললেন, এই ৩০ জনের মধ্যে ২৮ জনই ধরা পড়েছে এবং তাদের পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে। কেবল দুজন পালিয়ে আসতে পেরেছিল এবং তারাই এ সংবাদ দেয়। আমি এ সংবাদ শুনে মর্মাহত হয়েছিলাম। এরপর এখান থেকে লালগোলায় গেলাম এবং সেখান থেকে বহরমপুর। বহরমপুর গিয়ে দেখা হয় মেজর সফিউল্লাহর সঙ্গে। তিনি আমাদের সঙ্গী হন কলকাতায় আসার জন্য।

কলকাতায় এসে জানতে পারি আমাকে যুব শিবিরের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার দেশ থেকে আসা ছাত্র ও যুবকদের জন্য এই শিবির প্রতিষ্ঠা করে। পরে যুব অভ্যর্থনা শিবিরও করা হয়। যা-ই হোক, এই সময় আমি যে কাজটি করলাম তা হলো, প্রথমেই আমি এ কে খন্দকার ও তারপর প্রফেসর ইউসুফ আলীকে ঘটনা দুটির কথা বলি। আমি তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম আমাদের গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, অস্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। আমি তাঁদের বলেছিলাম, গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে কোনো অবস্থাতেই দেশের ভেতরে পাঠানো হবে না। দুই. সব গেরিলা আক্রমণ তৎপরতা বা কার্যক্রম আমাদের নেতৃত্বেই হবে, কোনো অবস্থাতেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে নয়। আমার এই পরামর্শ এ কে খন্দকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। পরবর্তীকালে সেটা কার্যকর করা হয়েছিল বলে আমি জানি।

সেক্টর ৭-এর এলাকা ছিল বেশ বড় এবং সেখানে সেনা কর্মকর্তার স্বল্পতাও ছিল। সে কারণে কোনো কোনো সাব-সেক্টরে অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়েছিল আমাদের হয়ে কাজ করার জন্য।

এ কে খন্দকার : ভারতে যাওয়ার পর প্রধানত আমাকে দুটি দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল—এক. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং দুই. আক্রমণ তৎপরতা বিষয়ে দেখভাল করা। প্রশিক্ষণের বিষয় সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে যে কথা বলা প্রয়োজন, তা হলো, প্রশিক্ষণ কতজনকে দেওয়া হবে, কখন থেকে দেওয়া হবে, সেটা ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক নেতৃত্বই এ সিদ্ধান্ত দিত।

বস্তুত মে মাসেই ভারত সরকার আমাদের বাছাই করা যুবক ছেলেপেলেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীই আমাদের ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যতদূর মনে পড়ে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজটি শুরু

হয়। এই পর্যায়ে দুই হাজার করে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাছাই করার সিদ্ধান্ত হয়। সেই বাছাই হতো আমাদের বিভিন্ন যুব শিবির থেকে। এমপি-এমএনএরা এই কাজটি করতেন। প্রশিক্ষণের জন্য কর্মসূচি যেটা করা হয়েছিল, সেটা ছিল বেশ সংক্ষিপ্ত। সময়ের কথা ভেবেই এই সংক্ষিপ্তকরণ। সময়সীমা ছিল মাত্র তিন থেকে চার সপ্তাহ। অথচ একজন গেরিলাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হলে এর চেয়ে বেশি, অন্তত তিন মাস সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এ কারণে প্রশিক্ষণের দিক থেকে কিছুটা ঘাটতি থেকেই যায়। তবে এসব যুবকের অধিকাংশই যেহেতু আন্তরিকভাবে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল, সেহেতু প্রশিক্ষণের বিষয়টি তখন খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি।

সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে প্রশিক্ষণ শেষে এসব ছেলেকে সরাসরি বাংলাদেশের সেক্টরগুলোতে পাঠানো হবে। আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব গেরিলার দায়িত্ব নেবে। গেরিলাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ, লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্টকরণ, অস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ও স্থির করবেন বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সেক্টর অধিনায়কেরা। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ কাজ বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে কেন করা হলো না? আসলে গেরিলা যুদ্ধের জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়। কারণ কোনো এক গভীর জঙ্গলে অথবা প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চলে টার্গেট ঠিক করা বা প্রকৃত অবস্থা জানা সদর দপ্তর থেকে বা কেন্দ্রীয়ভাবে করা সম্ভব ছিল না। তাই গেরিলা যুদ্ধের অধিকতর ও সন্তোষজনক ফল লাভের জন্য আঞ্চলিক অধিনায়কদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম থেকেই এ বিষয়টি হয়ে ওঠেনি, আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা সেভাবে দায়িত্ব পাননি বা দেওয়া হয়নি। এ কাজটি পুরোপুরি করত ভারতীয় সেনাবাহিনী। প্রথম দিকে আমাদের গেরিলাদের কাছ থেকে তেমনভাবে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া সম্ভব হয়নি। এই না-পাওয়ার প্রাথমিক কারণ—সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ, দ্বিতীয়ত ভারতীয় পক্ষ থেকে অস্ত্রশস্ত্র না পাওয়া। বিশেষত আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের কাছে প্রথম দিকে কোনো অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়নি। ভারতীয়রা সরাসরি আমাদের গেরিলাদের ১০ জনের একেকটি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে একটি পিস্তল ও ১০টি গ্রেনেড দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে, পরিকল্পনাহীনভাবে দেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিতেন। এই প্রসঙ্গে এর আগেও সংক্ষেপে বলেছি। এভাবে গেরিলাদের পাঠানোর ফল বেশ খারাপ হয়েছিল। কারণ গেরিলাদের সঙ্গে যে অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, তা দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আমরা জেনেছি, দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো এসব গেরিলার অনেকেই ভয়ে তার গ্রেনেডটি যেখানে-সেখানে মেরেছে বা ফেলে দিয়েছে। আবার শত্রুর লক্ষ্যবস্তুতে সামান্য একটি গ্রেনেড নিয়ে আঘাত হানতে গিয়ে ১০ জনের কোনো একটি দলের আটজনই শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। ১০ জনের আটজনেরই প্রাণ দেওয়ার সংবাদে আমরা তখন ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। একদিকে গেরিলাদের এই সামান্য অস্ত্রের কারণে পাকিস্তানিদের হাতে তাদের জীবনদান, অন্যদিকে যেখানে-সেখানে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ওই সব এলাকা বা গ্রামে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর নির্মম অত্যাচার আর হত্যাকাণ্ডের ফলে পরবর্তী সময়ে কোনো গেরিলা দল সামান্য গ্রেনেড হাতে গ্রামে প্রবেশ করলেই তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে গ্রামবাসীর কাছ থেকে। সেই সময় গ্রামবাসী উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে গেরিলাদের কার্যকলাপে।

জুন-জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশে গেরিলা তৎপরতা পর্যালোচনা করে আমরা বুঝতে পারলাম যে গেরিলাদের কাছ থেকে আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল, সেই প্রত্যাশা তারা পূরণ করতে পারছে না। ফলে, এই সময় দেশের অভ্যন্তরে এবং সেক্টরগুলোয় হতাশার ভাব লক্ষ করা গেল। আমাদের নিজস্ব উৎস এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রে এসব তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছাতে লাগল।

তখন আমরা উপলব্ধি করলাম যে এ'অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না বা চলা উচিত নয়। তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে গেরিলাদের প্রশিক্ষণ এবং দেশের অভ্যন্তরে তাদের আক্রমণ তৎপরতা পরিচালনা, অস্ত্রের স্বল্পতা, ব্যাপক হারে গেরিলা যোদ্ধাদের মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় বেশ জোরের সঙ্গেই উত্থাপন করা হয়। আমাদের গেরিলা যোদ্ধাদের ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রাখা, তাদের নিজস্ব পরিকল্পনামাফিক গেরিলাদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা যে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, সে কথাও তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। এমনকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছেও একাধিকবার বিষয়গুলো উত্থাপন করা হয়। তিনি বেশ কয়েকবার আমাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে আমি এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, কর্নেল ওসমানীসহ বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলাম। সেসব সভায়ও আনুষ্ঠানিকভাবে গেরিলা যুদ্ধ ও যুদ্ধবিষয়ক সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়। আমি নিজেও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের কাছে একাধিকবার গেরিলা তৎপরতা-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর আশু সমাধানের অনুরোধ জানিয়েছি।

এস আর মীর্জা : জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি হাকিমপুরে গিয়েছিলাম। সে কথা একটু আগেই বলেছি। ওখানে গিয়ে আমি ক্যাপ্টেন গিয়াসের কাছ থেকে জানতে পারি, এক ভারতীয় ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা আমাদের ৩০ জন গেরিলা যোদ্ধাকে, যাদের ভালো প্রশিক্ষণও ছিল না, কেবল হ্যান্ড-গ্রেনেড দিয়ে বগুড়ায় পাঠিয়েছেন গেরিলা আক্রমণ পরিচালনার জন্য। ওই ৩০ জনের মধ্যে ২৮ জনই ধরা পড়ে এবং পাকিস্তানিরা তাদের হত্যা করে। শুধু দুজন পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

মঈদুল হাসান : মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের প্রথম দল প্রশিক্ষণ শেষ করে বেরোয় জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। এদের ভেতরে পাঠানো হলো জুন মাসের চতুর্থ সপ্তাহে। এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বাস্তবিকভাবে মুক্তিবাহিনীর কোনো তৎপরতা দেশের ভেতরে কিংবা সীমান্তে ছিল না। প্রতিরোধ প্রায় থেমে যায়। এ রকম অবস্থায় প্রথম দলকে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়। যতটা আনাড়িভাবেই হোক, এরা যখন দেশের ভেতরে বোমা মেরে আসে, তা মানুষের মনে আবারও আশার সঞ্চার করে। তবে এমন প্রতিক্রিয়া সব জায়গায় হয়নি।

এদিকে এ সময় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এমএনএ-এমপিএদের শিলিগুড়িতে একত্র করে তাজউদ্দীনের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আস্থা-ভোট নেওয়ার কথা হয়। শিলিগুড়িতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় ৫ ও ৬ জুলাই। সেখানে তাজউদ্দীন আহমদের মন্ত্রিসভা ও তাঁর অনুসৃত নীতি সভায় উপস্থিত বেশির ভাগ এমএনএ-এমপিএ অনুমোদন করেন।

তার পরপরই কলকাতায় ১০ থেকে ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় সেক্টর অধিনায়কদের সভা। এ সময়ও মুক্তিযোদ্ধা বা গেরিলাদের বোমা ফাটানোর ফলে দেশের ভেতরে কী প্রতিক্রিয়া চলছে, সেটা বিশেষ কেউ জানতেন না। ভেতরে পাঠানো গেরিলা যোদ্ধাদের তৎপরতার প্রতিক্রিয়া আসতে লাগল জুলাই মাসের শেষের দিকে। সেক্টর অধিনায়কেরা কিন্তু প্রথম দিকে এ ব্যাপারে কৃতিত্বই নিতেন। তাঁরা কেউ কেউ বলতেন, আমার এলাকা দিয়ে গেছে ইত্যাদি। পরে যখন দেখা গেল ভেতরে কোনো কোনো জায়গায় এর প্রতিক্রিয়া খারাপ হচ্ছে, গ্রামের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী অত্যাচার করেছে, তখন তাদের বলতে শোনা যায়, কেন আমাদের না জানিয়ে এটা করা হলো বা আমাদের পরামর্শ মানা হয়নি ইত্যাদি।

এ কে খন্দকার : জুন মাস থেকে গেরিলা যোদ্ধাদের তৎপরতা শুরু হয়। মঈদুল হাসান যেটা বললেন, এর ভেতর দিয়ে আশার সঞ্চার হয়েছিল, এটা ঠিক। কিন্তু এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় ঘটতে থাকে, তা হলো, গেরিলা যোদ্ধারা যেখানে-সেখানে বোমা ছুড়ে ফেলে পালিয়ে আসছিল, যার ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এর বিরুদ্ধে যে প্রচারণা চালায়, তাতে এ ব্যাপারে গ্রামবাসীর উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়ে। এবং তাদের সবাই নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে থাকে। তাই আমরা জুন-জুলাই মাসে যে খবর পাই, তাতে একটা হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির চিত্রই ছিল। হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি ছিল দেশের ভেতরে, এমনকি দেশের ভেতর থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধ করতে এসেছিল তাদের মধ্যেও। তখন একটাই প্রশ্ন—আমরা কী করছি, আমরা তো কিছুই করতে পারছি না। এসব করে দেশের মানুষকে আমরা খেপিয়ে তুলছি।

সেই সময় আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা যা বলতেন, আমি সেটা সমর্থন করি। কারণ দেশের ভেতরে যে গেরিলা দল পাঠানো হয়, তার বেশ কিছু আসলে

আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের জ্ঞাতসারে করা হয়নি। ইন্ডিয়ান সেক্টর অধিনায়ক বা তাদের সেক্টরের ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারাই মুক্তিযোদ্ধাদের ওভাবে পাঠিয়ে দিতেন। এটা হয়েছে। অনেকের কাছ থেকে, প্রায় সব সেক্টর অধিনায়কের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমি অভিযোগ শুনেছি, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে। আর যে খবরগুলো পেতাম, তাতে মনে হচ্ছিল, আক্রমণগত কোনো তৎপরতাই পরিচালিত হচ্ছে না, অর্থাৎ কোনো যুদ্ধই হচ্ছে না।

আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের একটা আন্তরিকতা নিশ্চয়ই ছিল। আমাদের ছেলেদের এভাবে প্রাণহানি ঘটুক, এটা নিশ্চয়ই তাঁরা চাইতেন না। গেরিলা বা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম দিকে দেশের ভেতরে পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সেনা অধিনায়কদের মধ্যে একটা যৌথ পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল, যৌথভাবে গেরিলাদের পাঠানোর দরকার ছিল বা সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল। এটা হয়নি বলেই এ সমস্যা প্রকট হয়েছিল। দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরে।

এরপর আগস্টের দিকে এসে ঠিক হলো, এভাবে দুই হাজার করে প্রশিক্ষণ দিয়ে কিছু হবে না। আমি যখন জুন মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, তখন কয়েকটি সেক্টর ছিল। তবে তারও পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন বলে আমার মনে হলো। সে কারণেই এবং পুরো যুদ্ধটাকে একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে আনার জন্য জুলাই মাসের ১০ তারিখে সেক্টর অধিনায়কদের একটা সভা ডাকা হয়। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার—তেলিয়াপাড়ায় ৪ এপ্রিল যে সভা হয়েছিল, সেখানে ঠিক হয় যে জেনারেল ওসমানী হবেন মুক্তিবাহিনীর প্রধান।

এদিকে সেই সময় থেকে বিভিন্ন সেক্টর অধিনায়ক এবং মুক্তিবাহিনীতে কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন একটা গুঞ্জন ওঠে যে আমরা যেভাবে যুদ্ধ চালাতে চাই, জেনারেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি রেখে সেটা করা সম্ভব নয়। এটাকে কীভাবে গতিশীল করা যায় সেই পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই মাসের এই সভায় একটা সামরিক বা যুদ্ধ পরিষদ গঠন করার দাবি ওঠে। একই সঙ্গে আরেকটি দাবি ওঠে যে ওসমানী যেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন। আর যাঁরা যোগ্য লোক সামরিক বা যুদ্ধ পরিষদ করে তাঁদের সেখানে নেওয়া হোক। সেই পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁরা আমার নাম প্রস্তাব করেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল মেজর জিয়ার। কিন্তু এটা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি হলো, মেজর খালেদ মোশাররফ এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। ফলে এটা শেষ পর্যন্ত হয়নি। সবার মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা চলছিল এবং বিষয়টা বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত চলে গিয়েছিল।

এই সময় বিক্ষুব্ধ হয়ে কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগ তিনি মৌখিকভাবে করেন। লিখিতভাবে করেননি। এতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ খুব বিচলিত হন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, এ রকম অবস্থায়, এ রকম একটি

পদ থেকে পদত্যাগ করার একটা খারাপ প্রতিক্রিয়া গোটা মুক্তিযুদ্ধের ওপর পড়তে পারে। আবার খালেদ মোশাররফও প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন। এই সব মিলিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ কর্নেল ওসমানীকে অনেক বুঝিয়ে পদত্যাগ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হন।

সামরিক বা যুদ্ধ পরিষদ গঠনের ব্যাপারে জিয়াউর রহমান ও খালেদ মোশাররফের অবস্থান বিপরীতমুখী হলেও নিজ নিজ বিশ্বাস থেকেই তাঁরা এটা বলেছিলেন। খালেদ মোশাররফের বিশ্বাস বেশি ছিল কর্নেল ওসমানীর ওপর। মেজর জিয়াসহ আরও অনেকে এবং বেশির ভাগ সেক্টর অধিনায়কই চেয়েছিলেন একটা সামরিক বা যুদ্ধ পরিষদ হোক। এ ব্যাপারে তাঁদের অনেকে সোচ্চার ছিলেন। বিপরীত দিকে, খালেদ মোশাররফও সোচ্চার ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই অবস্থার একটা সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ওই সভায় আবেগময় এক বক্তৃতা দেন। এ বক্তৃতায় তিনি সবাইকে ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বান জানান।

তারপর সভা ঠিকমতো চলতে থাকে। এই সভায় কোন কোন সেক্টর কোথায় হবে, কে দায়িত্বে থাকবেন—এসব নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এখানে একটি বিষয় হঠাৎ প্রাধান্য পায়—আলোচনার শেষ পর্যায়ে পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সিদ্ধান্ত হয়, গেরিলা যুদ্ধ তো চলবেই, গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যখন পাকিস্তানি বাহিনীকে দুর্বল করে ফেলব, তখন সম্মুখসমরের প্রয়োজন হতে পারে। সেই সম্মুখসমরে যাওয়ার জন্য আমাদের ব্রিগেড প্রয়োজন হবে। এই বিগ্রেড শুধু সম্মুখসমরের জন্যই নয়, দেশ স্বাধীন হলে আমাদের যে নতুন সেনাবাহিনী গড়ে উঠবে, এটা হবে তার ওপর ভিত্তি করে।

এই সভার শেষে একটি ব্রিগেড করা হলো। সাধারণত ব্রিগেডের কোনো নাম হয় না। ব্রিগেডের সাধারণত নম্বর হয়, কিন্তু হঠাৎ জেড-ফোর্স নাম দিয়ে এটাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। এটা আমার পছন্দ হয়নি। তবে এ ব্যাপারে আমার একার বলার কিছু ছিল না। জিয়াকে এটা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাঁর নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে ব্রিগেডের নাম রাখেন। এটা তাঁর নামেই হতে হবে এটা ঠিক না, কিন্তু তার পরও এটা করা হয়েছিল।

এদিকে সেই সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও মেজর খালেদ মোশাররফ থেকে গিয়েছিলেন ওসমানীর সঙ্গে। তিনি ২ নম্বর সেক্টর অধিনায়ক, সেখানে তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল। আমি এ ব্যাপারে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে তাঁর দ্রুত সেখানে যাওয়া উচিত। কিন্তু তিনি আমার এই কথার গুরুত্ব দেননি।

যা-ই হোক, খালেদ মোশাররফ সেই সময় তিন-চার সপ্তাহ থেকে যান কলকাতায়। খালেদের যাওয়ার আগে এ সিদ্ধান্ত হয় যে ২ নম্বর সেক্টরেও একটা ব্রিগেড গঠন করা হবে—সেটার নাম হবে কে-ফোর্স। তখন কর্নেল ওসমানী দেখলেন কে-ফোর্স করতে হলে আরেকজনকে ডিঙিয়ে সেটা করতে হয়। তিনি

হচ্ছেন কে এম সফিউল্লাহ। কারণ খালেদ মোশাররফের চেয়ে জ্যেষ্ঠ ছিলেন মেজর সফিউল্লাহ। তাই তখন সফিউল্লাহর নামেও এস-ফোর্স নামে আরেকটি ব্রিগেড করা হয়। সুতরাং এই দুটো ব্রিগেড গঠনের বিষয়টি ওই সভার সিদ্ধান্তের বাইরে কর্নেল ওসমানী নিজেই নিয়েছিলেন। আর ব্রিগেডগুলো যে ব্যক্তিগত নামে করা হবে, এটাও কর্নেল ওসমানী নিজেই এককভাবে সিদ্ধান্ত নেন। এটা সভার সিদ্ধান্ত ছিল না।

এখানে একটা কথা না বলে পারা যায় না। তা হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যখন বিদ্রোহ করে দেশ ছেড়ে আসে, তখন তাদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। অনেকে আসতে পারেননি, অনেকে যুদ্ধাহত ছিলেন। সুতরাং তখন যে সামরিক শক্তি ছিল, তা দিয়ে তিনটি ব্রিগেড তো দূরের কথা, একটি ব্রিগেডও করা যায় না। একটি ব্রিগেড করতে হলে যে প্রয়োজনীয়তা, নতুন করে কর্মকর্তা, সৈনিক ও অন্যান্য লোকবল নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ ও লেখাপড়া, প্রশিক্ষিতদের মধ্য থেকে সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিক বাছাই করার জন্য সময়, তার কোনোটিই ছিল না। তার জন্য সময়ের, বিশেষত প্রশিক্ষণের জন্য একটা সময়ের প্রয়োজন। একজনকে ব্রিগেড ফোর্সে নেব, অথচ তাঁর প্রশিক্ষণ ঠিকভাবে হবে না, এটা তো হতে পারে না। এ সবের কোনোটাই আমাদের ছিল না। সে জন্য প্রয়োজনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য দিয়ে একটি ব্রিগেড করা হয়। যেখানে ৮০ শতাংশের নিচে নামলে একটি ব্রিগেড-ক্ষমতা কমে যায়। নতুন ব্রিগেডে আবার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদের মধ্যে ছিল আনসার, মুজাহিদ, ইপিআর, সিভিল ডিফেন্স ও পুলিশের লোক। এই যে বিভিন্ন শিক্ষার, বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের লোক নিয়ে একটি ব্রিগেড করা হলো, এতে করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্রিগেড হয়নি। ক্ষতি যেটা হলো, এই লোকগুলো আমাদের গেরিলা যুদ্ধে যদি নেতৃত্ব দিত, তাহলে আমাদের গেরিলা যুদ্ধে যে সাফল্য পেতে দেরি হয়েছিল, তা আমরা আরও আগে পেতে পারতাম, আরও বেশি সাফল্য লাভ করতাম বলে আমার বিশ্বাস।

মঈদুল হাসান: এই যে ব্রিগেড তিনটি গঠন করা হলো অ্যাড-হক ভিত্তিতে—তা গঠন করার মতো আমাদের নিজস্ব কোনো সম্পদ ছিল না। এদের খাওয়া-পরা, বাসস্থান, অস্ত্র, চলাচল, বেতার যোগাযোগ—সবকিছু আসত ভারত সরকারের কাছ থেকে। ভারত সরকারও তখন নিজস্ব একটা পরিকল্পনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে মে মাস থেকে। জুন মাসের মধ্যে তাদের সমর-পরিকল্পকেরা অনুমান করেন যে বাংলাদেশের একটা এলাকা তাদের মুক্ত করতে হবে। সেখানে বাংলাদেশের দখল প্রতিষ্ঠা করা যাবে, বাংলাদেশের প্রশাসন পাঠানো যাবে এবং সেটাকে বাংলাদেশ সরকার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অনেকগুলো কারণে এই মুক্তাঞ্চল বা 'লজমেন্ট এরিয়া' স্থাপন পরিকল্পনার বাস্তব ভিত্তি ছিল না। কারণ

সেটাকে কে রক্ষা করবে? কেননা পাকিস্তান এই মুক্তাঞ্চলকে আক্রমণ করতেই পারে তাদের বিরাট সৈন্য বাহিনী—বিমান নিয়ে, ট্যাংক নিয়ে। তা প্রতিরোধের ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। আর যদি সেনা ও অন্যান্য সাহায্য, অর্থাৎ বিমান ও ট্যাংক ভারতকেই দিতে হয়, তবে তো সরাসরি তা পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে পরিণত হবে, যে যুদ্ধের জন্য তারা তখন প্রস্তুত ছিল না। অন্যদিকে এর ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব রাজনৈতিক সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য বৃহত্তর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের মধ্যে ডুবে যেত।

এদিকে প্রায় একই সময়ে আমাদের সামরিক অধিনায়কেরাও এসেছেন জুলাইয়ের ১০ থেকে ১৫ তারিখে একটা সভা করার জন্য। তরুণ সেনা কর্মকর্তারা মনে করতেন, ওসমানীর অকার্যকর নেতৃত্বের অধীনে বিশাল সীমান্তজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধ যেভাবে চলছে সেভাবে চালানো সম্ভব নয়। একজন সমর্থ লোককে নেতৃত্বে বসাতে হবে। সে অনুপাতে তাঁরা পরিবর্তনের কথা বলেছেন, সমর পরিষদের কথা বলেছেন। আরও বলেছেন, আমরা যদি যুদ্ধের দিকে এগোতে থাকি, সাফল্য অর্জন করতে থাকি, তখন হয়তো আমাদের সম্মুখসমরে যেতে হবে। সে জন্য আমাদের ব্রিগেড দরকার হবে। ব্রিগেড গঠনের কথা এসেছে আমাদের দিক থেকেও। পাশাপাশি আমাদের যারা সাহায্য করেছে তাদের দিকটা, অর্থাৎ ভারত সরকারের চিন্তাটাও দেখতে হবে। এ ছাড়া সমর পরিষদ গঠনসংক্রান্ত বাগ্‌বিতণ্ডার পর মেজর জিয়াকে সন্তুষ্ট করার জন্য হয়তো কিছু একটা করার বা তাঁকে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার ছিল।

এই সভায় মেজর জিয়াই প্রস্তাব করেন যে এ কে খন্দকারকে প্রস্তাবিত সামরিক পরিষদের চেয়ারম্যান এবং কর্নেল ওসমানীকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হলে তা সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। সবাই ছিলেন এটার পক্ষে, শুধু খালেদ মোশাররফ ছাড়া। প্রস্তাবিত সমর পরিষদ গঠনের মাধ্যমে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে কর্নেল ওসমানীর অপসারণের ঘোর বিরোধী ছিলেন খালেদ মোশাররফ। তাঁর এই বিরোধী মনোভাবের কারণ ছিল সম্ভবত মেজর জিয়ার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বিরোধিতা। এ কে খন্দকারের সভাপতিত্বে সমর পরিষদ গঠিত হলেও সামরিক নেতৃত্ব পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীর সর্বজ্যেষ্ঠ অধিনায়ক জিয়ার হাতে চলে যাবে—সম্ভবত এমন আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে মেজর খালেদ মোশাররফের পক্ষে সমর পরিষদ গঠনে সমর্থন দেওয়া সম্ভব ছিল না। মেজর খালেদ মোশাররফের মনোভাব মেজর জিয়ার অজ্ঞাত ছিল না।

তাজউদ্দীনের মধ্যস্থতায় সমর পরিষদ গঠনের প্রস্তাব তুলে নেওয়া হয়। এবং প্রথম ব্রিগেড গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে। এদিকে খালেদ মোশাররফ সেই সভা শেষ হওয়ার পর আরও তিন-চার সপ্তাহ কলকাতাতেই থেকে গেলেন। তারপর তিনি কে-ফোর্স নামে আর একটা ব্রিগেড

গঠনের অনুমতি নিয়ে চলে যান। এই কথাগুলো তুলছি আমি এই কারণে যে, এর একটা দূরবর্তী প্রভাব আমরা দেখেছি মধ্য-সত্তরের রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে।

এ কে খন্দকার : এখানে আমি একটা কথা বলি, মঈদুল হাসান মুক্তাঞ্চল করার ব্যাপারে যে কথা বললেন, এটা আমার মতে তিনি বলেছেন ঠিকই। তবে সময়ের একটু তফাত হচ্ছে। সেটা হলো মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি। কিন্তু প্রথম দিককার কথা। এটা কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ের বা শেষ দিকের তো নয়ই। এটা মে কিংবা জুন মাসের একটি পদক্ষেপ। কিন্তু যখন জেড-ফোর্স করা হলো, আমার জানামতে জেড-ফোর্স করার পেছনের বিষয়টি হলো মূল বিষয়। আমরা যে গেরিলা যুদ্ধ করব, যখন শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে পারব, তখন আমাদের সম্মুখসমরে যেতে হবে। তার জন্য আমাদের একটি নিয়মিত বাহিনী দরকার। একটি উপযুক্ত বাহিনী দরকার। আর সেই বাহিনীই হচ্ছে এই বিগ্রেড জেড-ফোর্স, কে-ফোর্স এবং এস-ফোর্স। এই বাহিনীগুলোই পরে বাংলাদেশের পুরো সামরিক বাহিনী গঠন করবে।

মঈদুল হাসান : ভারতের 'ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস'-এর পরিচালক কে সুব্রামানিয়ামের একটি লেখা প্রকাশিত হয় *লন্ডন টাইমস* পত্রিকায় জুলাই মাসের সম্ভবত ১৩ তারিখে, যখন আপনাদের সভা চলছে। আমি পাঁচ-ছয় দিন পর সেই লেখা পড়ি। ৮ থিয়েটার রোডের উল্টোদিকেই ছিল ব্রিটিশ কাউন্সিল। ওখানে আমি ব্রিটিশ পত্রিকা পড়তাম।

আরেকটি বিষয় বলছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সক্রিয় হচ্ছে জুনের শেষ দিকে। এই জুনের শেষ দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনীকে কাজে লাগানো হয় মুক্তিযোদ্ধারা যেদিক দিকে যাওয়া-আসা করবে, সেই সব রাস্তা পরিষ্কার করার কাজে। এই জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের গোলন্দাজ বাহিনীকে সীমান্তে পাঠায় পাকিস্তানি বিওপি অর্থাৎ সীমান্তচৌকি বা ঘাঁটিগুলো ধ্বংসের জন্য। এরপর হঠাৎ একটা আর্টিলারি যুদ্ধ গড়ে ওঠে, যেটা নিয়ে পাকিস্তান সামরিক জান্তা খুব বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কেননা সেই সময় তাদের একটা কথাবার্তা চলছে আওয়ামী লীগের একাংশের সঙ্গে আপস মীমাংসা করার সম্ভাবনা নিয়ে। এই সময়ই ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী ইপিআরের যতগুলো চৌকি বা ঘাঁটি ছিল, তার প্রায় সবগুলোতে আক্রমণ করতে থাকে। বিশেষত সেই সব এলাকায়, যেসব এলাকা দিয়ে নতুন গেরিলা বা মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতরে প্রবেশ করানো যাবে। একই সঙ্গে দেশের ভেতরে গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা এবং সীমান্তে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের ফলে পাকিস্তানিদের সন্দেহ হয় যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশবিশেষ দখল করে নেওয়াই এই ভারতীয় তৎপরতার লক্ষ্য। এ থেকে মুক্তাঞ্চলের আশঙ্কাটা তাদেরও ছিল। অর্থাৎ কতগুলো বিষয় একই সঙ্গে পাশাপাশি ঘটছে।

আমি তখন কোনো নির্দিষ্ট ধারায় চলতাম না, আমার পক্ষে সেই সময় সঠিক ও নির্দিষ্ট ধারণা করা সম্ভবও ছিল না। আমি তাদের কাগজপত্র পড়ে, বিভিন্ন প্রচার পর্যালোচনা করে এবং অন্যান্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারছিলাম যে এই ব্রিগেডের ধারণাটা অনেকটা এসেছিল 'লজমেন্ট এরিয়া' বা মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য, ভারতের সমর-পরিকল্পকদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ভালোভাবে শুরু হয়নি। তাদের তৎপরতা ভালোভাবে শুরু হয় পরে, পাকিস্তানি বাহিনী নাস্তানাবুদ হওয়ার পরই ভাবা যেতে পারত একটি সম্মুখসমরের কথা। আমার ধারণা, এটা কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল না। এটা কীভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে—পরে অনেকেই অস্বীকার করেন—তাজউদ্দীন আহমদ নিজেও একবার বলছেন, ওসমানী সাহেব বলেছেন যে ব্রিগেড করতে হবে। তখন সবাই বলে, ঠিক আছে, এটা করা যাক, আমাদের তো কাজে লাগতে পারে। ভারতীয়রা বলল যে তারা সব দিতে রাজি আছে—অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, যানবাহন ইত্যাদি সব। সেভাবেই প্রথম ব্রিগেডটি গঠিত হয়েছিল।

এ কে খন্দকার : আপনি যা বলেছেন এ সম্পর্কে আমার দ্বিমত নেই। শুধু সামান্য তথ্য দিচ্ছি। সেটা হলো সময়ের ব্যাপার নিয়ে। কে সুব্রামানিয়ামের প্রবন্ধ প্রভাব ফেলেছিল এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমার জানামতে, যখন আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম, তখন সেখানেও মুক্তাঞ্চলের কথা উঠছিল। যদি একটা মুক্তাঞ্চল করা যায় তবে সেটা সহজ হয়। কিন্তু পরে জুলাইয়ে গিয়ে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে পাকিস্তানের আক্রমণ থেকে একটা ছোট মুক্তাঞ্চল রক্ষা করা খুবই অবাস্তব। সেই জন্যই পরে এটা বাতিল হয়। একটা ব্রিগেড গঠন করে আক্রমণ করার জন্য একটা সময়ের দরকার। এটা করার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করা হবে, এমন কথা ছিল না। এটা চিন্তা করা হয়েছিল যে গেরিলা যুদ্ধ করতে করতে একটা সময় আসবে যখন সম্মুখযুদ্ধের প্রয়োজন হবে, তত দিনে এই ব্রিগেড গঠন করা হবে।

জুলাই মাসে যেটা হলো, ব্রিগেড গঠন করা বিষয়ে আলোচনার পরপরই, ব্রিগেড গঠিত হয়ে গেল তা নয়। এর পরিকল্পনা, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অনেক ব্যাপার ছিল। তত দিনে হয়তো গেরিলাযুদ্ধ অনেক সাফল্য অর্জন করতে পারবে। তখন সঠিক সময় বা কোনো সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি, গেরিলাদের সাফল্যের পর এই বাহিনীগুলোকে কাজে লাগানো হবে। আমার ধারণামতে, এমনকি সদর দপ্তরে কর্নেল দাস, ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত ছিলেন; এঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হতো, তাঁরা গোয়েন্দা বিভাগের লোক ছিলেন। তবে বাঙালি হিসেবে ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমার মনে হয়েছে, তাঁরা মনে করতেন মুক্তাঞ্চলে বিষয়টি সম্ভব নয়। তবে এটা বলতে পারি যে

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকেই মুক্তাঞ্চলের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। ঠিক কখন সেটা শুরু হয়, সেটা বলতে পারব না।

মঈদুল হাসান : ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পরিকল্পনা করার কাজটা শুরু হয় মে মাসে। সব দেশেই সশস্ত্র বাহিনী চলে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মের ওপর ভিত্তি করে। ওই যে চিন্তার কথা বললেন, সেগুলো ছিল কিছু লোকের চিন্তা, মুখে মুখে চিন্তা; এর মধ্যে কোনো ধরনের সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল না। সত্যিকার অর্থে, আমাদের রণনীতি বলে কিছু ছিল না। তুরাতে ব্রিগেড গঠন করার চিন্তা শুরু হলো জুলাই মাসে। আর এই ব্রিগেড কাজ করতে শুরু করে আগস্ট মাসে। কর্নেল ওসমানী তাড়াতাড়ি নিজেই সবকিছু করতে পারতেন। আপনি যেটা বললেন, আরও দুটি ব্রিগেড করা হলো দুজনের নামে। এগুলোর প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হলো আগস্ট মাসে। এসব ওসমানী সাহেবই করলেন। ওসমানী সাহেবকে না বলার শক্তি মন্ত্রিপরিষদের কারও ছিল না। তাঁকে কেউ জিজ্ঞেসও করেনি যে, কোন সামরিক কৌশলের ওপর ভিত্তি করে আপনি এটা করলেন। এটা হলো আগস্ট মাসের কথা।

তারপর সেপ্টেম্বর মাসে ওসমানী সামরিক পরিকল্পনায় বলে দিলেন যে এই ব্রিগেড কোনো কাজে আসেনি। তাঁর এই পরিকল্পনা, যেটি আপনি পড়ে দেখে কেবল ভাষা ঠিক করে দিয়েছেন, তাতে ওসমানী বলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিগেড গঠন করা হয়েছিল, তা অর্জিত হয়নি, ভবিষ্যতে অর্জিত হবে বলেও মনে হয় না। কাজেই তিনি একাই সেগুলো ভেঙে ছোট ছোট দল করে ফেলার সিদ্ধান্ত দেন। জুলাই মাসে বলছেন একটি ব্রিগেড গঠনের কথা, জুলাই মাসের শেষে আরও দুটি ব্রিগেড করে দেন। আগস্ট মাসে প্রথম ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হলো, সেপ্টেম্বর মাসে এসে বলছেন, ব্রিগেড ভেঙে দাও। অথচ এই সময় আরও দুটি ব্রিগেডের জন্য বাছাই ও নিয়োগ-প্রক্রিয়া চলছে। এই সময় পর্যন্ত ব্রিগেডের জন্য প্রয়োজনীয় ৫০ শতাংশ লোকবলও হাজির করতে পারেননি মেজর সফিউল্লাহ। ডিসেম্বরে যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। ওসমানী তাঁকে বলেছিলেন, 'আশঙ্কার কিছু নেই, আমি সিলেট থেকে লোক এনে দেব।' কিন্তু তিনি তা দিতে পারেননি। এই রকম একটা বিশৃঙ্খলা ও খামখেয়ালির মধ্যে আমাদের সদর দপ্তরের কাজ চলত। আপনি (এ কে খন্দকার) আছেন বলেই আমি এসব কথা বলছি। আপনি বলুন, কোনো পেশাদার সেনাবাহিনী যেভাবে কাজ করে, সে ধরনের কাজকর্ম সেখানে হয়েছিল কি না।

এ কে খন্দকার : এটা সত্যি কথা। কতগুলো সত্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সত্য কখনো বিকৃত হতে পারে না। এটা সত্যি যে আমাদের যে সদর দপ্তর ছিল সেটা নামে মাত্র। কর্নেল ওসমানী ছিলেন, আমি ছিলাম, মেজর চৌধুরী, মেজর বাহার ছিলেন। আর একজন ডাক্তার এবং গোয়েন্দা বিভাগের একজন লোক

ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই ছোট সদর দপ্তরে সব কাজ একটা আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে হতো না। কর্নেল ওসমানী বিভিন্ন বিষয়ে একাই সিদ্ধান্ত নিতেন। তাতে কাজকর্মে একটা সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি হতো।

যে কথাটি মঈদুল হাসান বললেন, তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। যেমন—যে ব্রিগেডটি গঠন করা হলো, তার পেছনে যেমন কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা, চিন্তাধারা, গবেষণা বা অনুসন্ধান ছিল না, তেমনি ব্রিগেডটি ভেঙে দেওয়া হলো হঠাৎ করে। অথচ এই সময় এ কাজে যেসব লোককে ব্যস্ত রাখা হলো, তাদের যদি আমরা যুদ্ধের কাজে লাগাতে পারতাম, তবে আরও ফলপ্রসূ হতো। যুদ্ধের গতি আরও ত্বরান্বিত হতো। সেই অর্থে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুধু সদর দপ্তরে কেন, সেক্টরগুলোতেও হয়নি।

এখানে আর একটি কথা বলা দরকার, আমাদের নিজস্ব কোনো যোগাযোগব্যবস্থা ছিল না। আমরা সরাসরি সেক্টরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতাম না। আমরা খবরাখবর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দিতাম কলকাতায়। তারপর তারা তাদের সেক্টর অধিনায়কদের কাছে পাঠাত। সেই অধিনায়কেরা বাংলাদেশ সেক্টর সদর দপ্তরে পাঠাত। এতে করে অনেক সময় লাগত, অনেক সময় দেখা যেত এর গুরুত্ব আর থাকত না। এই খবর বিলম্বে পৌঁছার কারণে কোনো কাজে লাগত না। কিংবা প্রয়োগ করা সম্ভব হতো না। যেহেতু আমাদের নিজস্ব বেতারব্যবস্থা বা সিগন্যালস ছিল না, সে কারণে আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে সেক্টরগুলোতে ঘন ঘন যাতায়াত করতে পারতাম, সরাসরি তাদের নির্দেশ দিতে পারতাম, তাহলে সেটা আরও বেশি কার্যকর হতো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার জানামতে কর্নেল ওসমানী নিজে ১০ দিনের বেশি সদর দপ্তরের বাইরে যাননি। আমি কি ভুল বলছি?

মঈদুল হাসান : না, ভুল বলেননি, ওই রকমই হবে। এ প্রসঙ্গে আমি আর একটি কথা বলি। এই বেতারব্যবস্থা বা সিগন্যালসের ব্যাপারটা খুব জটিল ছিল। অনেক কথাই আমাদের সেক্টর সদর দপ্তরকে জানাতে হতো, সেগুলো ঠিক ভারতীয় ফরমেশনকে আমরা জানাতে রাজি ছিলাম না। কেননা আমাদের দিক থেকে কিছু অভিযোগ তাদের সম্পর্কেই ছিল। ফলে আমাদের সদর দপ্তরও জানাতে পারত না, সেক্টরও জানতে পারত না। বিষয়টা অক্টোবর নাগাদ মারাত্মক আকার ধারণ করে।

তখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সামরিক বিষয়াবলি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। আমি এ ব্যাপারে কথা বলতাম, দরকার হলে লিয়াজোঁ করতাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের ডিরেক্টর অপস মেজর জেনারেল বি এন সরকারের সঙ্গে। ভারতের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তিনিই আমাদের মুক্তিবাহিনীর চার্জে ছিলেন, ফোর্ট উইলিয়ামে বসতেন। তিনি বাংলাদেশের নিয়মিত

বাহিনী থেকে শুরু করে অনিয়মিত ফ্রিডম ফাইটার (এফএফ)-এর সমগ্র বিষয় দেখতেন। আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম, টেলিফোন ও বেতার আবিষ্কারের আগেও এই যোগাযোগ বা সিগন্যাল-ব্যবস্থা ছিল। দূরের বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা ছিল। তিনি বললেন, এটা কীভাবে? আমি বলেছিলাম, প্রতিদিন খবর দেওয়ার বা আনার জন্য বার্তাবাহক সেখানে দৌড়ে যেত কিংবা ঘোড়ায় চড়ে যেত। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম, 'আপনি প্রতিটি সেক্টরে তিনজন করে লোক ঠিক করে দিন। তারা প্রতিদিন প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং তাদের যেকোনো একজন সন্ধ্যাবেলায় নির্দিষ্ট কোনো একটি স্থানে এসে সেই প্রতিবেদন দিয়ে পরদিন আবার ফিরে যাবে। পরদিন অন্য একজন প্রতিবেদন নিয়ে আসবে। অনুরূপভাবে আমাদের সদর দপ্তরেও এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' যে বিষয়গুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ বা স্পর্শকাতর নয়, সেগুলো অবশ্যই টেলিফোনে বলা যেত, কোনো অসুবিধা ছিল না। এটা যে একটা সমস্যা, তা কখনো ওসমানী সাহেব এ কে খন্দকারকে বলেননি। আসলে সদর দপ্তরের যে প্রতিদিনের কাজকর্ম, তার মধ্যে কোনো ধরনের পেশাদারি ছিল না।

এ কে খন্দকার : আমি সে সময় প্রায়ই বিভিন্ন সেক্টর পরিদর্শনের জন্য বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু আমি কোথাও পৌঁছার পরপরই জানতে পারতাম, কর্নেল ওসমানী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সেক্টরে আমার থাকার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও আমাকে সদর দপ্তরে ডেকে পাঠানো হতো। কিন্তু এসে দেখতাম যে আলোচনার কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় নেই, এমনকি প্রয়োজনীয়তাও নেই। এভাবে আমাদের সদর দপ্তরের সঙ্গে সেক্টরের যোগাযোগ, তাদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের আমাদের অসুবিধার কথা বলা, তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানা এবং তাদের কর্মসূচি দেওয়া যে কীভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এই সম্পর্কে সদর দপ্তর কোনো কিছুই করত না।

মঈদুল হাসান আগে যে কথাটি বলেছেন, তা ঠিক, ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের যতই বন্ধু হোক, তবু তো আমাদের নিজস্ব কিছু বিষয় ছিল, গোপনীয়তা ছিল। যেমন এই যে যুদ্ধের প্রথম দিকে আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের না বলে ভারতীয় সেনা অধিনায়কেরা গেরিলা পাঠাতেন, তাতে আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা বিক্ষুব্ধ হতেন। এ রকম পরিস্থিতিতে তাদের কী ধরনের নির্দেশ দেওয়া হবে, সেটাও আমরা করতে পারতাম না। আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের আরও করণীয় সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারতাম না।

ভারতীয়রা আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের না জানিয়ে কাজ করত। তারা তাদের ওপরওয়ালাদের নির্দেশে কাজ করত। প্রথমেই তাদের সেক্টর অধিনায়কদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হতো। এরপর তারা তাদের কাজ করত, অর্থাৎ এরপর তারা

তাদের মতো করে অধীনস্থ অধিনায়কদের কাছে সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য পাঠাত। এতে আক্রমণ তৎপরতায় অনেক অসুবিধা হতো। আমরা আমাদের এই অসুবিধার কথাগুলো বলতে পারতাম না। এটা অনেকটা লুকোচুরির মতো ছিল।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল এই যোগাযোগের অভাব। এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হতো সেক্টরগুলোতে বা বিভিন্ন যুদ্ধ এলাকায় ঘন ঘন সফর করে। সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ নিলেই এই অভাব পূরণ করা সম্ভব হতো। এক দিনের জন্য গিয়ে আমি যদি আগরতলায় থাকতে পারতাম, কী এমন ক্ষতি হতো? সেটাও হতো না। জেনারেল ওসমানী সম্ভবত মাত্র ১০ দিন সদর দপ্তরের বাইরে ছিলেন এই নয় মাসের যুদ্ধকালে। আমি অন্তত আশা করতাম যে তিনি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে অধিনায়কদের সঙ্গে কথা বলবেন, গেরিলাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং আমি এটাও আশা করতাম যে তিনি বেশির ভাগ সময়ই সদর দপ্তরের বাইরে থাকবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ওসমানীর উপস্থিতিটাই একটি বিরাট সাহস, বিশেষত যোদ্ধাদের নৈতিক সাহস জোগাত।

আর এই যোগাযোগের শূন্যতার ফলে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে, তাদের নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। এটাও হওয়ার কথা ছিল না। আমি মনে করি, তাদের ওখানে আছি, তাদের অস্ত্র নিচ্ছি, তাদের রেশন খাচ্ছি। ওখানে আমাদের বলার কিছু ছিল না। কারণ আমাদের অস্ত্র ছিল না। তাদের সঙ্গে আরও কৌশলী হয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেত। তাদের সম্পৃক্ত রেখেও কাজ করা যেত। যেমন এখানে আক্রমণ করলে কেমন হয়, এটা কীভাবে করা যায়—ইত্যাদি করে তাদের হয়েই আমরা এগোতে পারতাম। এ ধরনের যোগাযোগ আমাদের খুব কম ছিল।

মঈদুল হাসান: আগেও যা বললাম, আপনি (এ কে খন্দকার) বলতে পারেন—আমাদের প্রকৃতই কোনো রণনীতি ছিল কি না। একটার পর একটা ব্রিগেড গঠন করা হচ্ছে, এটা-ওটা করা হচ্ছে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোনো কাজেই আসছে না। আমাদের রণনীতি বলে কিছুই ছিল না, যেটা প্রণয়ন করা সদর দপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ, যুদ্ধ তৎপরতার কৌশল বা পরিকল্পনা তৈরি করা, যেটা পরিকল্পনাকারীদের কাজ। আমাদের যুদ্ধকৌশল প্রণয়নের জন্য এ রকম কোনো পরিকল্পনাকারী ছিলেন না। এ কাজে কাউকে দায়িত্বও দেওয়া হয়নি। অপস প্ল্যান বলতে ওই একটাই কাগজ পাওয়া গেছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। সেটা হলো নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ কমান্ড ও কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠার বিষয়। অধিকাংশ জায়গাতেই সেনাবাহিনীর সাধারণ সেনারা বিদ্রোহ করেন। তাঁদের চাপে বা অনুরোধে সেনা অধিনায়ক ও কর্মকর্তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সাধারণ সেনারা এই

বিদ্রোহের মূল শক্তি ছিলেন। তাদের যে নেতৃত্বদানকারী অধিনায়ক—মেজরই হোক, ক্যাপ্টেনই হোক—তাঁদের তাঁরা যুদ্ধে নামতে বাধ্য করেন। যুদ্ধে নামার পর তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হন। এভাবে তাঁরা একটা প্রতিষ্ঠিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ নতুন অবস্থায় উপনীত হন। স্বভাবতই তাঁদের একটা নতুন নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনার প্রয়োজন ছিল। এটা করার দায়িত্ব ছিল ওসমানীর। এই অভিজ্ঞতা তাঁর আছে মনে করে তাঁকে বিদ্রোহী সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি করা হয়। তাঁর কাছেই প্রত্যাশিত ছিল পাকিস্তানি নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসা সেনাসদস্য ও কর্মকর্তাদের একটা নতুন নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা। এটা করতে হলে দরকার ছিল তাঁদের সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং তাঁদের দায়িত্ব বা কাজের লক্ষ্য দেওয়া। তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আনার এগুলোই ছিল গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। কিন্তু তিনি একাই সব সিদ্ধান্ত নিতেন। এর ফলাফল মোটেই ভালো হয়নি।

তখন প্রায় প্রতিদিন সকালবেলা তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আমার বৈঠক হতো। তাঁকে আমাদের সামরিক তৎপরতার মান নিয়ে মাঝেমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখেছি। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হলে তাঁর ও প্রধান সেনাপতির পর্যায়ে যে আলোচনার প্রয়োজন ছিল, সেটা তাঁদের মধ্যে ছিল না। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে একটি পর্যালোচনা, কিছুটা গবেষণা বা অনুসন্ধান করতে হয়। ওসমানী কতগুলো গৎবাঁধা কথা সর্বদা বলতেন—আমরা তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে ফেলব, তাদের ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলব, তাদের পরাজিত করব ইত্যাদি। কিন্তু সঠিক ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা এবং কোনো নির্দিষ্ট কাজের কৌশল তাঁর ছিল না। অন্যদিকে এই সেক্টরগুলোকে কীভাবে সংহত করা যায়, কীভাবে তাদের দায়িত্ব দেওয়া ও বুঝে নেওয়া যায়, তা তিনি কখনো করেননি। কিংবা তাদের সঙ্গে কীভাবে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে, এটাও তিনি করেননি। ওসমানী আমাদের সেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ইনটেলিজেন্সের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে—ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত অথবা কর্নেল দাসের মাধ্যমে, তাঁদের বলে দিতেন অমুক জায়গায় এই সংবাদটা পৌঁছে দিতে হবে। ফলে অনেক তথ্য আদান-প্রদান করা যেত না। তা-ছাড়া প্রথম থেকেই একটা পরনির্ভরশীলতা গড়ে উঠেছিল। যখন কোনো দেশের একটি বাহিনীর সংবাদ আদান-প্রদান ও আদেশ-নির্দেশ অন্য দেশের কোনো বাহিনীর মাধ্যমে করা হয়, তখন সেটা সর্বাংশে ওই বাহিনীর নিজস্ব নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিভাত হয় না।

আমি মনে করি, আমাদের পুরো সেনা সংগঠনটা শুরু থেকে এমনই দুর্বল অবস্থায় ছিল। পুরো সেনাবাহিনী কতগুলো বিচ্ছিন্ন সেক্টর বাহিনী হিসেবে আচরণ শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে গিয়ে তারা কেবল নিজের

এলাকাটুকুই দেখত, নতুন মুক্তিযোদ্ধারা এদের কাছে প্রশিক্ষণ নিত, এরাই তাদের যুদ্ধ শেখাত এবং এদের সুবিধামতো তৎপরতা চালাত। পাশাপাশি দেখা যেত, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও ছাত্রনেতারা এই সব সামরিক কর্মকর্তার অত্যধিক প্রশংসা করতেন, গুণগান করতেন, তোয়াজ করতেন। এর মধ্য দিয়ে সামরিক কর্মকর্তাদের রাজনৈতিকীকরণের একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, যেটা ছিল সামরিক শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

তাহলে কী হলো? একদিকে যখন সামরিক বাহিনীকে নতুন ব্যবস্থায় নিয়ে আসা দরকার, নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা দরকার, প্রতিদিনের তৎপরতার জন্য দায়িত্ব দেওয়া, সহযোগিতা দেওয়া দরকার, সামরিক শৃঙ্খলা ও দক্ষতা কার্যকরভাবে বাড়ানো দরকার, এসব বিশেষ কিছু হলো না। এই শিথিল শৃঙ্খলাগত পরিস্থিতিতে তখনই আমাদের মনে হতো, কোনো কোনো সামরিক কর্মকর্তা যেভাবে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের দিকে যাচ্ছেন, তার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

ওই বছর থেকেই আমি এ কে খন্দকার সাহেবকে চিনি। তিনি খুবই স্বল্পভাষী মানুষ। তখন আমি লক্ষ করলাম যে এই একটা লোক সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে কম কথা বলেন, কিন্তু ভালো শ্রোতা। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত মেজর জেনারেল বি এন সরকারের সঙ্গে সপ্তাহে একবার করে আমার নিয়মিত বৈঠক হতো। আমি সেসব প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও মাঝেমধ্যে এর অংশবিশেষ খন্দকার সাহেবকেও বলতাম।

তখন আমরা একটি বিষয় নিয়ে ভাবতাম। এ কে খন্দকার, এস আর মীর্জা, আহমেদ রেজা ও আমি—ভাবতাম। আমরা মাঝেমধ্যে বলতাম যে আমাদের সেনাবাহিনীর যাঁরা উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠলেন, যাঁরা কোনো নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে এলেন না, তাঁদের প্রভাব বাংলাদেশের ওপর অনেক দিন পর্যন্ত হয়তো বাড়তে থাকবে। হয়েও ছিল—স্বাধীনতার প্রথম ১০ বছর পর্যন্ত এটা ছিল।

এ ছাড়া আরেকটা ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ঘটেছিল। সেটা আমরা এপ্রিলের পরেই লক্ষ করেছি এবং সামরিক বাহিনীর লোকদের মুখেও পরবর্তী সময়ে শুনেছি। তাঁরা মনে করতেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব তো আমাদের যুদ্ধে ডাক দেননি। কী করতে হবে বলেননি। আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম বলেই লড়াই শুরু করেছি। অস্ত্র তুলে নিয়েছি। লড়াই আমাদেরই করতে হবে।

এখান থেকে আমরা কতগুলো উপাদান পাই। গোটা মার্চ মাসে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। তাঁরা কখনো বলতেন স্বায়ত্তশাসনের কথা, কখনো ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার কথা, কখনো বা কনফেডারেশনের কথা ইত্যাদি। তাই পাকিস্তানিদের আক্রমণের পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে সফল হয় আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্তহীনতার

কারণে। নেতৃত্ব পুরো পরিস্থিতি অর্থাৎ পাকিস্তানিদের তৎপরতার গভীরতা বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁরা ঠিক করতে পারেননি—যদি পাকিস্তানিদের আক্রমণ নেমে আসে, তাহলে আপৎকালে কে নেতৃত্ব দেবে, কোনো পরিষদ বা ব্যক্তি নেতৃত্ব দেবে কি না, স্বাধীনতা ঘোষণা করবে কি করবে না, তারা কি দেশের ভেতরে থাকবে, নাকি অন্য কোনো অঞ্চলে গিয়ে কাজ করবে—এসব বিষয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি।

এ অবস্থায় কোনো রাজনৈতিক নির্দেশনা ছাড়াই সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে। সেনাবাহিনীর তরুণ কর্মকর্তারা, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা মনে করতেন যে তাঁরা রাজনৈতিক নেতাদের চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার পক্ষে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর সত্তরের ও আশির দশকে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মনস্তাত্ত্বিক জোর, শক্তিটা কোথা থেকে এল—এটা আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বুঝে উঠতে পারেননি।

সেনাবাহিনীর মনস্তত্ত্ব

এস আর মীর্জা : সেনাবাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক শক্তি সম্পর্কে মঈদুল হাসান যে কথা বললেন, সে সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলতে চাই। সামরিক বাহিনীতে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ প্রবেশ করেছিল পাকিস্তান আমলে। তবে অধস্তন পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তারা তখন ক্ষমতার জন্য উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠেননি। শুধু উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারাই রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী হয়েছিলেন। এটা সেনাবাহিনীর সমগ্র অংশ নয়। মুক্তিযুদ্ধকালে এটা হয়েছিল সেক্টর অধিনায়কদের পর্যায়ে। আর এই যে তিনটা ব্রিগেড বাহিনী তৈরি করা হলো যে প্রক্রিয়ায়, সেটা তাদের রাজনৈতিকীকরণে প্রভূত সহায়তা করেছে।

মঈদুল হাসান : পাশাপাশি বিমানবাহিনীর কথা বলা যায়। বিমানবাহিনী গঠনে এ কে খন্দকার ছিলেন। এই বিমানবাহিনীর কাজ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধকালে নভেম্বর মাসের দিকে। এই বাহিনী গঠন করা হয়েছিল সঠিকভাবে। নৌবাহিনীর কথাও বলা যায়। বাংলাদেশ নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠন করা হয় ভারতীয় নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে। এই বাহিনী গঠনের বিষয়টি আমাদের দিকে তাজউদ্দীন আহমদসহ আর দু-তিনজন ছাড়া কেউ জানতেন না। ভারতীয় নৌবাহিনীর অধিনায়কেরা আমাদের নৌ-কমান্ডো বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেন, তাদের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডোরা অনেক বড় বড় তৎপরতায় অংশ নিয়েছে। তাদের কাজকর্ম ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। তারা অনেক বড় অপারেশন করেছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অন্য কোনো দল এত সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে পারেনি। এখনো মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডোদের অবদান আমাদের সমাজে পুরোপুরিভাবে স্বীকৃত হয়নি। এরা পরবর্তীকালে কোনো প্রকার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এগোয়নি, কিংবা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েনি। কোনো সমস্যাও তারা সৃষ্টি করেনি।

তাহলে দেখা যায় যে সামরিক বাহিনীকে যদি একটা নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে উপযুক্তভাবে গড়া যায়, তাহলে ফল ভালো পাওয়া যায় এবং এটা অন্যের জন্য হুমকির কারণ হয় না। তখন আমাদের সামরিক বাহিনীতে নেতৃত্বের অভাব ছিল। যাঁর হাতে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হলো—তিনি সেক্টরগুলোকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখলেন। তিনি কারও সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ রাখতেন না, তাঁদের সমস্যাগুলো বোঝার চেষ্টা করতেন না, তাঁদের কোনো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বিশেষ কোনো সাহায্য করতে পারতেন না। তাঁরা তাঁদের নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রণহীন পরিবেশে, একই সঙ্গে নৈরাশ্য ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে বড় হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠেছে ওয়ার-লর্ড বা সেনানায়কসুলভ আত্মগরিমায়। এঁরা রাজনীতিবিদদের কর্মদক্ষতা ও দায়িত্ববোধের অভাব দেখে তাঁদের অশ্রদ্ধা করতে শেখেন। শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে অশ্রদ্ধাজনিত কথা সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের মুখে আমি এবং আরও অনেকেই ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালে শুনেছি। তিনি যে একটা সফল অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁর যে একটা বিরাট অবদান ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি নিজে ধরা দেওয়ার ফলে এই যে অত্যন্ত বিরূপ দুর্দশার মধ্যে সবাই পড়েছি, এটা নিয়ে সবার মধ্যে আলোচনা হতো।

এস আর মীর্জা : সামরিক বাহিনীতে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের জন্য আমাদের দেখতে হবে পাকিস্তানের ইতিহাস। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের ভেতর দিয়ে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং সামরিক বাহিনীতে দুর্নীতি শুরু হয়। সেই সেনাবাহিনীরই অংশ বিদ্রোহ করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর। ওদের এই উচ্চাভিলাষ এখানেও কার্যকর ছিল। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় কিছু উর্ধ্বতন ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা—ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, মেজর জেনারেল, তাঁদের মধ্যে আমি একটা বিষয় লক্ষ করেছি—তাঁরা কখনোই রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন না এবং তাঁদের রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে কোনো আলোচনা বা সমালোচনা করতেন না। কিন্তু পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিয়ে সমালোচনা হতো। এই ধারাবাহিকতা আমাদের সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিকীকরণে ইন্ধন জুগিয়েছে। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

মঈদুল হাসান : পাকিস্তানের সেনাবাহিনী অন্তত একটা দক্ষ সমন্বিত বাহিনী ছিল। আমি এখানে যেটা বলতে চাইছি, সেটা হলো, আমাদের বাহিনীর নেতৃত্ব মূলত ছিল বিভক্ত, অনেকে উচ্চাভিলাষী, তাদের পেশাগত দক্ষতা বড় একটা ছিল না। এই পেশাদারি না থাকায় এটা ভয়াবহ পরিণতির দিকে যায়।

এ কে খন্দকার : এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই। অনেকে বলেন যে বিদ্রোহ করার পর সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করা কঠিন, আমি এটা বিশ্বাস করি না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সেনাসদস্যরা বিদ্রোহ করেছিলেন দেশের প্রতি তাঁদের গভীর ভালোবাসা থেকে এবং দেশকে স্বাধীন করার জন্য। এই বাহিনীকে যদি সংগঠিত করা যেত—কাঠামোগত দিক থেকে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনাগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করতে পারলে এই বাহিনী সেই সময় যতটা অবদান রেখেছে, তার চেয়ে আরও বেশি অবদান রাখতে পারত।

এ প্রসঙ্গে এখানে আমি উদাহরণ হিসেবে আমাদের বিমানবাহিনীর কথা তুলে ধরতে চাই। সত্যি কথা বলতে কি, বিমানবাহিনী আমিই গড়ে তুলি। সে কথা একটু আগে মঈদুল হাসান বলেছেন।

এখানে এর পটভূমি প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমি একসময় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে বলেছিলাম, আমাদের বিমানবাহিনী গঠন করা দরকার। এটা একটা পর্যায়ে কাজে আসবে এবং একটা সময় পুরো যুদ্ধের গতিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবে। আমি তাঁকে আরও বলেছিলাম যে পাকিস্তান বিমানবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা এই পাইলট যদি বসে থাকেন, তাহলে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা কমে যেতে বাধ্য। তাঁদের উড্ডয়ন করার সুযোগ দিলে তাঁরা তাঁদের ব্যবহারিক জ্ঞানের ধারা অব্যাহত রাখতে পারবেন।

তাজউদ্দীন আহমদ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তখন আমার এই কথাগুলো শুনেছিলেন। এর কিছুদিন পর তিনি একদিন আমাকে তাঁর দপ্তরে ডেকে পাঠান। খবর পেয়ে আমি তখনই তাঁর দপ্তরে গেলাম। গিয়ে দেখি তাঁর দপ্তরে কয়েকজন বসে আছেন। কে কে উপস্থিত ছিলেন, তা আমার এখন মনে পড়ছে না। তাঁদের মধ্যে খুব সম্ভবত ভারতীয় প্রতিরক্ষাসচিব কে বি লালও ছিলেন।

যা-ই হোক, তাজউদ্দীন আহমদ আমাকে বললেন, 'ওনারা এসেছেন, ওনাদের সঙ্গে আপনি আলাপ করেন।' তাঁরা আমার সঙ্গে যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বললেন। আলোচনার একপর্যায়ে আমি বিমানবাহিনী গঠনের কথা বলতেই কে বি লাল বললেন, এই মুহূর্তে তাঁদের পক্ষে কোনো বিমান আমাদের দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের নিজেদেরই যুদ্ধবিমানের স্বল্পতা রয়েছে। তবে একটা কাজ করা যেতে পারে, বাংলাদেশের পাইলটরা ভারতীয় স্কোয়াড্রনে উড্ডয়ন করতে পারেন। আমি তাঁকে বললাম যে পাইলটদের বিমান উড্ডয়নের কতগুলো নিয়ম আছে। কতগুলো কোড আছে। কতগুলো আইনগত ব্যাপার আছে। তাঁরা যে ভারতীয় বিমানে উড্ডয়ন করবেন, তখন কোন দেশের কোড ব্যবহার করবেন। ভারত, না বাংলাদেশ।

আমার এই কথায় অবশ্য তাদেরও কোনো উত্তর ছিল না। কে বি লাল বললেন, বাংলাদেশের পাইলটদের ভারতীয় কোড ও নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হবে। তিনি আরও বললেন যে মাস দেড়েকের মধ্যে এ ব্যাপারে কাজ শুরু করা যায়। এভাবে কথা হওয়ার পর আমি তাজউদ্দীন আহমদকে একান্তে বললাম যে বাস্তবিক পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। আমরা একটি স্বাধীন দেশ, আমরা অন্য দেশের কোড বা নিয়মকানুন অনুসরণ করতে পারি না। তারপর আমি আবার কে বি লালকে বললাম এবং অনুরোধ করলাম, যদি সম্ভব হয় তাহলে বাংলাদেশের পাইলটদের যেন কাজে লাগানো হয়। এটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য সহায়ক হবে।

এর কিছুদিন পর আমি জানতে পারলাম যে ভারত সরকার বাংলাদেশকে একটি ডিসি থ্রি বিমান দিচ্ছে। আর প্রশিক্ষণের জন্য জায়গা দিচ্ছে ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশ নাগাল্যান্ডের একটা প্রত্যন্ত এলাকায়—জঙ্গলবেষ্টিত একটি স্থানে। স্থানটির নাম হলো ডিমাপুর। সেটা একটা প্রায় অব্যবহৃত বিমানক্ষেত্র। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে বলা হলো বিমানবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নিতে। এরপর আমি তখন ওখানে, অর্থাৎ ভারতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। সুলতান মাহমুদ ওখানে ছিলেন না। আমার পর সুলতান মাহমুদই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। একটা যুদ্ধে ওঁর পায়ে গুলি লেগেছিল। সুলতান মাহমুদ ছাড়া বাকি সবাইকে নিয়ে গেলাম ডিমাপুরে। কলকাতায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের আগেই সেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর নিয়ে গেলাম ফ্লাইট লে. শামসুল আলমকে। পরে চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সুলতান মাহমুদকে তুলে নিয়ে ডিমাপুরে গেলাম। ওখানে যেদিন বিমানবাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়, সেদিন ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর। সেই হিসেবে এ দিনটিকে আমরা স্বাধীনতার পর থেকে বিমানবাহিনী দিবস হিসেবে পালন করে থাকি।

যা-ই হোক, সেখানে আমি তিনটি আলাদা শাখা প্রতিষ্ঠা করি। প্রত্যেকের নেতৃত্ব ও কাজ আলাদা করে দিই। নির্দেশ দিই কেউ কারও কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। তাদের সঠিকভাবে বিন্যাস করে আমি ফিরে আসি। তার পরও আমি মাঝেমধ্যে ডিমাপুরে যেতাম। আমি সম্ভবত তিন-চারবার ডিমাপুরে গিয়েছি। যাওয়ার পরপরই তাদের সঙ্গে জরুরিভাবে মিলিত হতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। আমাদের তৎপরতা চালাতে হবে রাতের বেলা। তা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। দ্বিতীয় হচ্ছে, রাতের বেলায়ও আমাদের উড্ডয়ন করতে হবে অত্যন্ত নিচু দিয়ে, যাতে রাডার যন্ত্রে আমরা ধরা না পড়ি। ডিমাপুরে যে পরিত্যক্ত বিমানক্ষেত্র ছিল, তার চারপাশে তখন ছিল গভীর জঙ্গল। ওখানকার বড় গাছগুলো ২৫ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত উঁচু ছিল। ওখানে এত ঘন গাছ যে ওপর থেকে পড়লে গাছেই আটকে থাকতে হবে, মাটিতে পড়বে না।

তখন আরেকটি সমস্যা হয়। সেটা হলো আমরা লক্ষ্যবস্তু কোথায় করি। মুক্তিযুদ্ধের বছরটা ছিল বৃষ্টির বছর। আকাশ মেঘে ঢাকা। অন্ধকার রাত। আমরা ঠিক করলাম যে পাহাড়ের চূড়ায় একটা সাদা প্যারাসুট ফেলে দেব। এটাই হবে আমাদের লক্ষ্যবস্তু। চারদিকে অন্ধকারের মধ্যে এটাকে দেখা যাবে। ওই সাদা প্যারাসুট লক্ষ্য করে তারা অ্যাটাক ড্রাইভ দিত। আমি আমার অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা বলতে পারি যে আমি নিজেও এত ঝুঁকিপূর্ণ ডিগবাজি কম করেছি। আকাশের মেঘ আর গাছের মধ্যে ব্যবধান এত অল্প যে অত্যন্ত সাবধানে ডিগবাজি দিতে হতো। কারণ মেঘের মধ্যে চলে গেলে বিমান অবতরণ করার জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর কোনো কারণে একটু নিচে চলে এলে গাছে আঘাত লাগবে। এই অন্ধকারের মধ্যে ডিগবাজি দিয়ে ফিরে আসা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল।

এখানে আরও একটি কথা বলে রাখি, যখন ৩ ডিসেম্বর রাতে এঁরা আক্রমণ চালালেন, একজন অভিজ্ঞ পাইলট হিসেবে বলতে পারি—অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার ভেতর দিয়ে অত দূর থেকে এসে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় ও ঢাকার উপকণ্ঠে গোদনাইলের তেল ডিপো আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেওয়া বিশাল একটা সফলতা। আমি এর জন্য, এই সফলতার জন্য তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। এসব পাইলট সারা রাত ধরে এই সব আক্রমণ পরিচালনা করতেন। কারণ আমাদের ট্রেনিং হতো রাতের বেলায়। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গড়ে ওঠে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে। তাদের মধ্যে একটি নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আর একটি বাহিনী সম্পর্কেও বলা প্রয়োজন। সেটা হলো নৌ-কমান্ডো। এই বাহিনী সম্পর্কে মঈদুল হাসান একটু আগে বলেছেন। নৌ-কমান্ডোদের তৎপরতা সম্পর্কে মানুষ খুব একটা জানত না। অন্যদিকে এই বাহিনীর গঠন-প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমদ ছাড়া আর কেউ খুব একটা জানতেন না। কর্নেল ওসমানী জানতেন। আমি জানতাম। নৌ-কমান্ডোদের বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয় রাখা হয়েছিল। আমাদের এই নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠনের দায়িত্বে ছিলেন একজন ভারতীয় ক্যাপ্টেন। তাঁর নাম সামন্ত সিং। তিনি ভারতীয় নৌবাহিনীর অত্যন্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। সেনাবাহিনীর কর্নেলের সমান। বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন একই পদমর্যাদার। ক্যাপ্টেন সামন্ত সিংয়ের সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল।

১৫ আগস্টে নৌ-কমান্ডোরা সফল অভিযান পরিচালনা করে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে। যখন দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা প্রায় ঝিমিয়ে পড়েছিল, আমরা ভালো অপারেশন করতে পারছিলাম না, আমাদের মনোবল দুর্বল হয়ে আসছিল, ঠিক এই সময় নৌ-কমান্ডোদের এই সফল আক্রমণ পরিচালনা সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের গতিকে উদ্দীপ্ত করেছিল। আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে এই নৌ-

কমান্ডোদের আক্রমণ তৎপরতার কথা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল। এর ফলে অশান্ত বন্দরে বিদেশি জাহাজ আসা কমে গেল। জাহাজের বীমার হার অত্যন্ত বেড়ে গেল। ফলে আগের মতো বন্দরে জাহাজ আসত না। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিও জড়িয়ে পড়ল। যখন ধারণা করা হচ্ছিল যে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা দুর্বল হয়ে আসছে, তখন নৌ-কমান্ডোদের এই আক্রমণ সাড়া জাগিয়ে তুলল।

পরে এই নৌ-কমান্ডোরা দেশের বিভিন্ন স্থানে—চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, দাউদকান্দি প্রভৃতি জায়গায় আক্রমণ করেছে। এই নৌ-কমান্ডোদের মধ্যে মাত্র সাত-আটজন ছাড়া বাকি সবাই ছিল নতুন। তাদের তখন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর আগে থেকেই প্রশিক্ষিত ওই সাত-আটজন পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছিল। এরা তখন ছিল প্যারিসে। তাই বলা যায় যে সদর দপ্তর থেকে যদি নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেত, ঠিকভাবে সংগঠন গড়ে তোলা হতো, তাহলে সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীকালে যে সব সমস্যা হয়েছিল, তা হতো না।

আমরা যদি সদর দপ্তর থেকে সেক্টরগুলোয় নিয়মিত যোগাযোগ করতে পারতাম, সংযোগ রাখতে পারতাম, খবর আদান-প্রদান করতে পারতাম, মাঠপর্যায়ে গিয়ে তাদের সমস্যাগুলো বুঝতে চেষ্টা করতাম, তাহলে তখন যে যোগাযোগ-শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা হতো না। এর ফলেই ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ তৎপরতা চালাতে সমস্যা হয়েছে। তার ফলে পরবর্তী সময়ে সামরিক বাহিনীতে নিয়ম-শৃঙ্খলায় শিথিলতা নেমে এসেছিল। অনেকে বলে থাকেন যে গেরিলা যুদ্ধে এটা হয়ে থাকে। ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধ, কোরিয়ার গেরিলা যুদ্ধে এটা হয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধ, কোরিয়ার গেরিলা যুদ্ধ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাদের গেরিলা যুদ্ধে কোনো ধরনের শৃঙ্খলার অভাব ছিল না।

একটা সামরিক বাহিনীতে যে একটা কাঠামো, যে নেতৃত্ব-কাঠামো গড়ে ওঠে, তাতে যে শৃঙ্খলা থাকে বা যে শৃঙ্খলা থাকা প্রয়োজন, এটা প্রধানত যোগাযোগের অভাবের কারণে আমাদের পক্ষে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এর অর্থ এই নয় যে আমাদের গেরিলা বাহিনীর অবদানকে খাটো করে দেখা হবে। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, এদের অবদান ছাড়া যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হতো না। গেরিলা বাহিনী যে সাফল্য অর্জন করেছিল, এই সাফল্য ছাড়া এত অল্প দিনে এই যুদ্ধ শেষ হতো না। হয়তো এর চেয়ে বেশি সাফল্য আমরা পেতে পারতাম, এর চেয়ে বেশি আক্রমণ তৎপরতা আমরা চালাতে পারতাম, এর চেয়ে আরও সুশৃঙ্খল হতে পারত। এর অর্থ এই নয় যে সবাই বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। আরও ভালো কাঠামো নিয়ে আমরা বেরিয়ে আসতে পারতাম। এটা সম্ভব হয়নি শুধু যোগাযোগের কারণে। আর যুদ্ধকালে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে সেক্টর অধিনায়কদের ক্ষমতা

দিতেই হতো। তবে অবশ্যই সেটা একটা সীমিত অবস্থার ভেতরে বা সীমাবদ্ধতার ভেতরে দিতে হতো। কারণ যে সেক্টর চট্টগ্রাম বা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কাজ করছে, তাকে আক্রমণ তৎপরতা পরিচালনার স্বাধীনতা দিতেই হবে। সুতরাং বিভিন্ন বিষয় ঠিকভাবে জানানো, সুন্দরভাবে জানানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ জন্য শুরু থেকেই বিভিন্ন সেক্টরকে একটি একক নেতৃত্বের অধীনে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

মঈদুল হাসান : এ কে খন্দকার মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে যে প্রশংসা করলেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। আমরা আলাপ করছিলাম নিয়মিত বাহিনী নিয়ে। বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর, সেক্টর অধিনায়ক, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ—এসব বিষয় নিয়ে। আর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে এবং তাদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর ক্ষেত্রে সেক্টর অধিনায়কেরা অনেক কাজ করেছিলেন। কিন্তু এর ওপর যেভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়—সেই পদ্ধতিটা সেক্টর অধিনায়কদের ছিল না।

গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ আলাদা রকমের হয়। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে তত্ত্বগতভাবে এতটুকু অবহিত ছিলাম যে একটি গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তরেও রাজনৈতিক অবকাঠামো থাকতে হয়। গেরিলা যুদ্ধের সমগ্র অবকাঠামোর একটা অংশ হলো—যাঁরা প্রশিক্ষণ দেবেন, যাঁরা অস্ত্র দেবেন, যাঁরা তাঁদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠাবেন তাঁদের নিয়ে। অবকাঠামোর আরেকটি অংশ থাকে দেশের অভ্যন্তরে গেরিলাদের প্রবেশের পর। সেখানে তাদের ওপর নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভার পড়ে গোপন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের ওপর। যেমন ফ্রান্সে কমান্ডোরা বিমান থেকে প্যারাসুট দিয়ে নামার পর দেখা যেত, একটি গোপন রাজনৈতিক শাখার সহায়তায় এরা পরিচালিত হচ্ছে। তারা কোথায় লুকিয়ে থাকবে, আহত হলে কীভাবে কোথায় সেবা-শুশ্রূষা হবে, কী কৌশলে আক্রমণ করতে হবে, ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের স্থানীয়ভাবে অবহিত করা হতো।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা কোনোক্রমেই সম্ভব হয়নি। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর হামলার পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে আওয়ামী লীগের বেশির ভাগ নেতা-কর্মী ভারতে চলে যান। পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে বামপন্থীরাও ভারতে চলে যান। ফলে গোটা দেশে এক রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই রাজনৈতিক শূন্যতা কোনো কোনো জায়গায় ঘুচতে শুরু করে অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে—যখন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের সেনাবাহিনীকে সীমান্তে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আদেশ দেয়। এই ভারতীয় তৎপরতা মোকাবিলার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গোটা সীমান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সুযোগে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সাধারণ দেশবাসীর সহযোগিতা লাভ করেন এবং দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক ধরনের অবকাঠামো গড়ে ওঠে।

আমাদের যদি সামগ্রিক রণকৌশল থাকত, তাহলে আমরা অনেক আগেই দেশের ভেতর রাজনৈতিক অবকাঠামো তৈরির চেষ্টা করতাম। এটা করার উদ্যোগ বা চেষ্টা যে করা হয়নি তা নয়। সেপ্টেম্বর মাসে ঠিক হয়েছিল রাজনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের একজন সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হবেন, যাঁর মূল দায়িত্ব হবে দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কী কারণে উপদেষ্টা পরিষদকে সেই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি, তা আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। রাজনৈতিক অবকাঠামোর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও অক্টোবর-নভেম্বরে মুক্তিযোদ্ধারা যে সাফল্য দেখিয়েছে, শত্রুকে যতটা বিপর্যস্ত করে তুলেছে, তার ফলে ডিসেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনী অধিকাংশ জায়গাটিতেই দ্রুত এগোতে শুরু করে, যা ছিল অনেকটা রুট মার্চের মতো। কয়েকটি জায়গা ছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কোথাও বিশেষ বড় বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

আমাদের নিয়মিত বাহিনী প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি যথার্থ সামরিক নেতৃত্বের অভাবে, রণনীতির অভাবে। বিশেষ করে নন-কমিশন্ড পর্যায়ে ভালো মনোবল, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও এদের সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়নি কার্যকর নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে, যোগাযোগের অভাবে। ক্রমে অক্টোবর মাসের শেষ দিক থেকে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী ক্রমাগত সীমান্তযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের অনেকে মনে করতে লাগলেন, ভারতীয়রাই যখন যুদ্ধ করছে, আমাদের ঝুঁকির মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী নিজেও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সেনাবাহিনীর ম্যানুয়েলস তৈরির মতো লড়াইবহির্ভূত কাজে। যুদ্ধের পুরো বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হয় ভারতীয় বাহিনীর হাতে। ধরেই নেওয়া হয় যুদ্ধ তারাই করবে। আমাদের শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেশের ভেতর ফিরে আসা—যাতে আমাদের প্রত্যেক অধিনায়কের লোকবল বড় থাকে। এটা ছিল তাঁদের নাম্বার গেম—সংখ্যা বৃদ্ধির খেলা।

যুদ্ধকালে এবং পরে নানা অনভিপ্রেত পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনীর ভেতরে এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা গড়ে ওঠে। একটি সেনাবাহিনীকে যদি সঠিক নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা না যায়, তাহলে তার যে কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে, রাজনীতির জন্য তা কী ভয়াবহ দুর্যোগ ডেকে আনতে পারে—প্রথম ১০ বছরে দুজন রাষ্ট্রপতির সামরিক বাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা তা দেখেছি।

এ কে খন্দকার : এটা ঠিক যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। মঈদুল হাসান সাহেব বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের

সামরিক বাহিনীর মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার একটা মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়। এটা আংশিক সত্য। গোটা সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এটাও সত্য যে সামরিক বাহিনীর বিশাল অংশ এই সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রতিষ্ঠিত সামরিক সরকারের অধীনে তারা কাজ করেছে। একটা সুশৃঙ্খল বাহিনী বলেই তারা এটা করেছে। গোটা সামরিক বাহিনী এই অভ্যুত্থানগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে দেশে একটা গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। সাংবিধানিক বা অসাংবিধানিকভাবে যে-ই ক্ষমতায় এসেছে, শৃঙ্খলার স্বার্থেই তারা তা মেনে নিয়েছে। হয়তো তাদের স্বার্থ বা ক্ষোভ জড়িত ছিল, কিন্তু এগুলোর তারা বিরোধিতা করেনি।

মঈদুল হাসান : সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলার দিকটা এসেছে আরও অনেক পরে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এই সেনাবাহিনী একসময় একটা কঠোর সুশৃঙ্খল বাহিনীর অধীনে ছিল। সেখান থেকেই বিদ্রোহ করে তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এরপর তাদের কোনো সঠিক নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধকালে ১৪০০ মাইল সীমান্তে ছড়িয়ে থাকা এই সেনাবাহিনীকে কোনো নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনতে না পারার কারণে তারা অনেকটা স্বাধীন মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এক ধরনের বড় সমরনায়ক বা সেনানায়কের মনোভাব তাদের পেয়ে বসে। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে তাদের মনোজগতে এক ধরনের আত্মগরিমা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলারও বিকাশ ঘটেনি।

১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড হলো, তাতে সেনাবাহিনীর দুটো ইউনিট জড়িত ছিল। তাও আবার শুধু ঢাকা শহরে। এটার বিরুদ্ধে গোটা সশস্ত্র বাহিনী—সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী—কেউই কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারল না। এটা থেকে বোঝা যায় যে তখনকার সামরিক নেতৃত্ব খুব একটা কার্যকর ছিল না। এটা প্রমাণ করে সামরিক বাহিনীতে তখনো সত্যিকার অর্থে নেতৃত্ব-কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এরপর জিয়াউর রহমানের শাসনামলে একটার পর একটা সামরিক অভ্যুত্থান হতে শুরু করে। জিয়ার হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত বোধহয় ১৫-২০টা সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় এসব অভ্যুত্থান হয়েছে। সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলাবিরোধী এই সব কার্যকলাপ চলতেই থাকে, যত দিন পর্যন্ত এসব রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন সামরিক কর্মকর্তার সংখ্যা বেশি ছিল। অভ্যুত্থান, হত্যা, পাল্টা-অভ্যুত্থান, সামরিক আদালতে বিচার, প্রাণদণ্ড ইত্যাদির ভেতর দিয়ে এই মুক্তিযোদ্ধা সামরিক কর্মকর্তাদের সংখ্যা কমে আসে। স্বাধীনতার পর সশস্ত্র বাহিনীতে যেসব নতুন সেনা, বিমান ও নৌ-কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলো, তাঁরা

এসেছেন ক্যাডেট কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল থেকে। পাবলিক স্কুলের এঁরা মেধাবী ছাত্র, ভালো ছাত্র—তাঁদের বেড়ে ওঠার ভেতর দিয়ে সামরিক বাহিনীতে ক্রমশ শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

সামরিক বাহিনীতে এই পরিবর্তনটা ঘটল নতুন কর্মকর্তাদের উত্থান ও পুরোনো কর্মকর্তাদের বিদায়ের পর। এই নতুন কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক আবহাওয়াটা জানেন, তাঁরা জানেন এই সময়ে সামরিক শাসন বিশ্বব্যবস্থা মেনে নিতে রাজি নয়। দেশের ভেতরও তাঁরা জানেন যে রাজনীতিটা ঠিক তাঁদের জায়গা নয়। তাঁরা তাঁদের পেশার দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। ফলে আমরা আজ একটা সুশৃঙ্খল সশস্ত্র বাহিনী পেয়েছি। তাঁরা শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁদের পেশাগত দক্ষতার জন্য।

কিন্তু আমরা যেটা বলেছি, সেটা হলো, সামরিক বাহিনীর ওপর মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত। এর ফলে সেনাবাহিনীকে সমন্বিত করা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত এ দেশের সামরিক বাহিনীর ওপর, শাসনব্যবস্থার ওপর, রাজনীতির ওপর অনেক দিন পর্যন্ত চলে।

এ কে খন্দকার: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে হত্যাকাণ্ড ঘটে, তার সঙ্গে জড়িত ছিল দুটি ইউনিট। ঢাকায় অন্য কোনো ইউনিট এর সঙ্গে জড়িত ছিল না। এখন কথা হচ্ছে, এরা বিদ্রোহ করল কেন? একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে অশান্ত করা সশস্ত্র বাহিনীর কাজ নয়, সেখানে একটা নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা অবশ্যই কাজ করছে। নতুবা সারা দেশে বিক্ষিপ্তভাবে এই সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে সেনাবাহিনী অবস্থান নিত। তাই তারা পক্ষেও যেমন অবস্থান নেয়নি, তেমনি বিপক্ষেও অবস্থান নেয়নি। বস্তুত একটা স্থিতিশীল অবস্থাকে তারা অস্থিতিশীল করতে চায়নি।

মুক্তিযুদ্ধের পর সামরিক বাহিনী মানসিক দিক দিয়ে ভাবত, আমরা কেন নেতা হতে পারব না! রাজনৈতিক নেতারা আমাদের নেতৃত্ব দিতে পারেননি। এই নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষার কারণেই অনেকগুলো সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। এটা সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্তির আশায়। প্রতিটি সামরিক অভ্যুত্থানে দেখা যায়, খুবই কমসংখ্যক সামরিক কর্মকর্তা এগুলোর সঙ্গে জড়িত থাকেন। গোটা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনী এর সঙ্গে ছিল না। এ কারণেই বলব, সামরিক বাহিনী একটা শৃঙ্খলার ভেতরে ছিল। যদি এমন হতো—কোথাও সমর্থন পেল, কোথাও পেল না, তাহলে সারা দেশে একটা বিধ্বংসী তৎপরতা শুরু হয়ে যেত। এটা কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীতে হয়নি।

আমি মঈদুল হাসানের সঙ্গে একমত যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা ও নেতৃত্বের অভাব সামরিক বাহিনীর কিছু কর্মকর্তার মনে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

তাঁদের মনে হয়েছিল, এ রকম দুরবস্থার মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিছু করতে পারেননি, আমরা কেন নেতৃত্ব গ্রহণ করব না? এ ব্যাপারে মঈদুল হাসানের সঙ্গে আমার কোনো দ্বিমত নেই। আমি শুধু বলব, স্বাধীনতা-পরবর্তী সামরিক বাহিনীর হত্যা আর অভ্যুত্থানের রাজনীতিতে গোটা সশস্ত্র বাহিনী জড়িত ছিল না। এটা কিছুসংখ্যক সামরিক কর্মকর্তার কাজ মাত্র। কিছুসংখ্যক সামরিক কর্মকর্তাই বারবার এটা ঘটিয়েছেন। আরও একটি ব্যাপারে আমি মঈদুল হাসানের সঙ্গে একমত, পরবর্তী সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য কর্মকর্তা নেওয়া হয়েছে ক্যাডেট কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলগুলো থেকে। এঁরা অনেক বেশি পেশাদার ও মেধাবী। ফলে এখন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী। এরা অত্যন্ত দক্ষ ও পারদর্শী। বিভিন্ন শান্তি মিশনে এরা অত্যন্ত সুনাম কুড়িয়েছে।

পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা সেনাসদস্য প্রসঙ্গ

মঈদুল হাসান : স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে বাঙালি সামরিক সদস্যরা ফিরে আসার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হলো এবং সামরিক অভ্যুত্থানগুলোতে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।

এ কে খন্দকার : আমি মনে করি, পাকিস্তানে অবস্থানরত সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য এঁদের কিছুসংখ্যক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করতে সক্ষম হয়েছেন। বাকিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি বলে তাঁদের দেশপ্রেম কম ছিল। পাকিস্তানফেরত বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি এ ধরনের নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা ভুল হবে। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধা সামরিক কর্মকর্তাদের যে জ্যেষ্ঠতা দেওয়া হলো, এটা সামরিক বাহিনীর ভেতরে বিরাট মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধানের সৃষ্টি করে। এটা আমি বারবার বলেছিলাম যে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের আর্থিক সুবিধা দেওয়া হোক, পুরস্কৃত করা হোক, অন্যভাবে সুবিধা দেওয়া হোক বা তাঁদের বীর বলে ঘোষণা করা হোক; কিন্তু পদোন্নতি নয়। সশস্ত্র বাহিনীতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান নেতৃত্বের ধারাবাহিকতার পরিপন্থী। সশস্ত্র বাহিনীতে থাকা অবস্থায় যে আমার দুই বছরের অধস্তন, তিনি আমার জ্যেষ্ঠ হয়ে আমার অধিনায়ক হয়ে যাবেন—এটা মেনে নেওয়া যায় না।

আমি বিমানবাহিনীতে সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ ছিলাম। তার পরও আমি এই জ্যেষ্ঠতা প্রদানের বিরুদ্ধে ছিলাম। অনেকেই আমাকে বলতেন, আপনি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি গভীরভাবে বিশ্বাস

করতাম যে সশস্ত্র বাহিনীতে জ্যেষ্ঠতা প্রদানের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা মোটেও ঠিক নয়। এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে পাকিস্তান ফেরত সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ ছিল। তাঁরা হয়তো এটা প্রকাশ্যে বলতেন না, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে বলতেন।

এই জ্যেষ্ঠতা প্রদানের বিষয়টি নিয়ে সশস্ত্র বাহিনীতে ক্ষোভ ছিল। আরেকটি বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা হলো, তাঁদের যাচাই-বাছাই করা হয়েছিল। এই যাচাই-বাছাইয়ে পাকিস্তানফেরত অনেক সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মনে এই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল যে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পারেনি বলে তাঁদের দেশপ্রেম কম। আর একটি বিষয় নিয়ে ক্ষোভ ছিল—সেটা হলো যেসব সামরিক কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের বীর হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। আর একজন তাঁর সমকক্ষ কিংবা তাঁর জ্যেষ্ঠ, তাঁকে সেভাবে দেখা হচ্ছে না। এ বিষয়টি পাকিস্তানফেরত কর্মকর্তাদের পীড়িত করত। এ থেকে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। এটাকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

এই যুদ্ধে যাওয়ার কারও সুযোগ ছিল, কারও এই সুযোগ ছিল না। এর অর্থ আবার এই নয় যে পাকিস্তানে যাঁরা ছিলেন সুযোগ পেলে তাঁদের সবাই মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতেন। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত কিছু বাঙালি বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেননি। যদিও তাঁদের যোগ দেওয়ার সমূহ সুযোগ ছিল। আবার এমন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাকে আমি জানি, যাঁরা যুদ্ধে যোগদান না করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। সুতরাং এ বিষয়গুলোকে সরলীকরণ করা ঠিক নয়। কারণ, পুরো বিষয়টিতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য থাকতে বাধ্য।

তার পরও একটি বিষয় ছিল জ্যেষ্ঠতা, অপরটি ছিল যাচাই-বাছাই করা। যাচাই-বাছাইয়ের ব্যাপারে তাঁদের ক্ষোভ ছিল যে তাঁদের সন্দেহ করা হচ্ছে। আমি মনে করি, যাচাই-বাছাইয়ের বিষয়টি ঠিক ছিল। এ জন্য তাঁদের মনে ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। আরেকটি বিষয় ছিল, তাঁরা যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি, বাংলাদেশে থাকলে কিংবা সুযোগ থাকলে হয়তো তাঁরা যুদ্ধে যোগ দিতেন। এই যে যুদ্ধে যোগ দিতে পারা না-পারার তফাতটা, তাঁদের মনে তা ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মঈদুল হাসান : এ কে খন্দকার সাহেব এ বিষয়টি ভালো জানবেন। বাইরে থেকে আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হলো, পাকিস্তান থেকে যেসব বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিক বাংলাদেশে এলেন, তাঁদের অধিকাংশকেই ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালে নিরস্ত্র করে রাখা হয়। তাঁদের অনেককে একটা জায়গায় আটকে

রাখা হয়। স্বাধীনতার পর তাঁদের আরও বছর দুয়েক লেগে যায় দেশে ফিরে আসতে। একজন সক্রিয় সামরিক কর্মকর্তা বা সৈনিক, তিনি যুদ্ধে যোগদান করতে পারলেন না, অথচ দেশের জন্য তাঁর একটা গভীর অনুভূতি আছে, একটা দীর্ঘ সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন, দেশে ফিরে আসার জন্য দুই থেকে তিন বছর অপেক্ষা করলেন। দেশে ফিরে আসার পর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শাসন দেখলেন, সেটা ছিল তাঁদের জন্য একটা বড় আঘাত। যেভাবে দেশ চলছে, যেভাবে সশস্ত্র বাহিনী চলছে—এটা তাঁরা তাঁদের প্রত্যাশার সঙ্গে মেলাতে পারেননি। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী আর যা-ই হোক একটা অত্যন্ত সুসংগঠিত, উচ্চ শৃঙ্খলাপূর্ণ সংস্থা। এসব সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিক বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা যখন দেশে ফেরেন ১৯৭৩-১৯৭৪ সালের দিকে, তখন দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় এত বেড়ে গেছে যে সেটা ছিল তাঁদের জন্য পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা। খাওয়া-পরা, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে চলাফেরা—সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ আরেক ধরনের সামাজিক ভিড়ে তাঁরা পড়ে যান। তাঁদের মধ্যে একটা ক্ষোভ, একটা বিতৃষ্ণা দানা বেঁধে ওঠে—এই স্বাধীনতা কি আমরা চেয়েছিলাম? দেশে সব জিনিসের দাম বেশি, সব জিনিসের অভাব। এই অভাব সবাই সমানভাবে ভাগ করে না। একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। বাড়িঘর ও ধনদৌলত তারা দখল করছে। আর অন্য লোকদের ভোগান্তি হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে তাঁদেরও একটা রাজনৈতিকীকরণ করা শুরু হলো দেশে ফেরার পর।

এ কে খন্দকার ঠিকই বলেছেন, জ্যেষ্ঠতা একটি কারণ, যাচাই-বাছাই আর একটি কারণ। তারপর জ্যেষ্ঠতা দুই বছর হলে হয়তো তত বড় সমস্যা হতো না। যে লোকটাকে কেউ দেখেছেন মেজর, পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে দেখলেন সেই অফিসারটি ব্রিগেডিয়ার বা মেজর জেনারেল হয়ে গেছেন। পেশার ক্ষেত্রে এই অসম্ভব রকমের পরিবর্তনে তাঁরা অভ্যস্ত হতে পারেননি। এসব দিক থেকে তাঁদের মধ্যে একটা হতাশাবোধ কাজ করেছে। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সামরিক বাহিনীর পাকিস্তানফেরত অংশ জড়িত ছিল। রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের শাসনামলে তাঁরা সুযোগটা আরও খানিকটা পেয়ে যান। এরশাদের মাধ্যমে বলা যায় তাঁরা প্রায় পুরো ক্ষমতা দখল করে বসেন। আর একটি বিষয় হলো, পাকিস্তানফেরত এই সামরিক কর্মকর্তারা কোনো সামরিক অভ্যুত্থানে জড়িত হননি। এরশাদের অভ্যুত্থানে তাঁদের জড়িত করা হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানফেরত সামরিক কর্মকর্তারা কোনো অভ্যুত্থানে জড়িত হননি।

এ কে খন্দকার : মঈদুল হাসান যেটা বলেছেন, পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার পর তাঁদের মনে একটা হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি,

জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি তাঁদের মনে হতাশা সৃষ্টি করেছিল। আমি মনে করি, এটা শুধু পাকিস্তানফেরত সামরিক কর্মকর্তা-সৈনিকদের বেলায় প্রযোজ্য নয়, এটা মুক্তিযোদ্ধা, সামরিক কর্মকর্তা-সৈনিকদের বেলায়ও প্রযোজ্য। মুক্তিযোদ্ধাদেরও হতাশা ছিল, আমরা কিসের জন্য যুদ্ধ করলাম! এ রকম রাজনীতি ও শাসনের জন্য যুদ্ধ করিনি। সুতরাং এ ক্ষোভটা সবার মধ্যে ছিল।

আমি আর একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম। সেটা মঈদুল হাসান অন্যভাবে বলেছেন। সামরিক বাহিনীর কতগুলো বিষয় আছে—তাদের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা, তাদের শৃঙ্খলা, তাদের ব্যবস্থা, তাদের কাঠামো। এগুলো এমন একটি ব্যাপার, যেগুলো কোনো গভীর কারণ না থাকলে ভাঙে না। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ভেঙেছিল, কারণ, সেটা অনেক বড় কারণ ছিল। এখানে অস্তিত্বের কারণ ছিল।

মঈদুল হাসান : সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালে বিদ্রোহ করার মধ্য দিয়ে যে চরিত্রটি অর্জন করে, তার অভিঘাত বারবার এখানকার সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের ধারাবাহিকতার ওপর এসে পড়ে। ১৯৮১ সালের পর এটা অনেকটা প্রশমিত হয়ে আসে। তার পরও যে একেবারে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল, তা নয়।

এ কে খন্দকার : দেশে কোনো একটা বড় পরিবর্তন হলে তার একটা অভিঘাত সমাজ ও রাজনীতিতে এসে পড়ে। সেটা জনসাধারণের মধ্য থেকে হোক, আর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে হোক। মঈদুল হাসান যা বলেছেন তা সত্য কথা। বারবার এর ঘাত-প্রতিঘাত এসে পড়েছে সেনাবাহিনীর ওপর। এই অভিঘাত সারা দেশের ওপর পড়েছে। সামরিক-বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রে। কিন্তু এই অভিঘাতের ফলে সমগ্র সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে বসেনি। সেনাবাহিনীর কারও কারও নেতৃত্বের প্রতি একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিছুসংখ্যক সদস্য মনে করেছেন, নেতৃত্ব হাতে নিয়ে তাঁরা দেশ চালাবেন। তাই সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক লোক সমস্যা ও সংকটের সৃষ্টি করেছেন বারবার। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাইছি, এই সামরিক অভ্যুত্থান, ক্যু ইত্যাদি প্রতিবারই কিছুসংখ্যক কর্মকর্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটা সারা দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। দেশ শাসন, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় সারা দেশের মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই কিছু সেনা কর্মকর্তার মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিল। এটা আমি লক্ষ করেছি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

এস আর মীর্জা : এখানে আমি আর একটি কথা বলতে চাই। স্বাধীনতার পর সামরিক বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের যে দুই বছর জ্যেষ্ঠতা দেওয়া হয়, এটা

মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। যুদ্ধের সময় আমরা কখনো শুনিনি যে এটা দেওয়া হবে। যুদ্ধের পর এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল। এটার ভীষণ ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল সামরিক বাহিনীর ওপর। যে মুহূর্তে অধস্তন কর্মকর্তা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে তাঁর ঊর্ধ্বতন বা জ্যেষ্ঠ হয়ে যান, তখন সামরিক বাহিনীতে কোনো ধরনের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা থাকে না।

এ কে খন্দকার : এখানে আমি আর একটি কথা বলতে চাই। স্বাধীনতার পর সামরিক বাহিনীতে এই দুই বছরের জ্যেষ্ঠতা দেওয়ার বিষয়টির আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। এ কথা আগে একবার বলেছি। তখন আমি বলেছিলাম, আমার যে অধস্তন, তাঁকে যদি আমার জ্যেষ্ঠ বা ঊর্ধ্বতন করা হয়, তাহলে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা—সবকিছু ভেঙে পড়তে বাধ্য। এটা সেনাবাহিনীর জন্য মোটেই ভালো হবে না। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, তাঁরা দেশের জন্য বিরাট কিছু করেছেন। তাঁদের অন্য যেকোনোভাবে সম্মান দেওয়া হোক। কিন্তু জ্যেষ্ঠতা নয়। তার পরও দুই বছরের জ্যেষ্ঠতা দিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর ভেতরে এক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করা হয়। নেতৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটাকে কোনো সামরিক কর্মকর্তা স্বাগত জানাতে পারেন না। এটা বেসামরিক প্রশাসনেও দেওয়া হয়েছে। সেখানেও এর একটা খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তবে সেখানকার চেয়ে বেশি খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে সশস্ত্র বাহিনীতে। কারণ যে আমার ছাত্র ছিল, সে যদি পেশায় জ্যেষ্ঠ বা ঊর্ধ্বতন হয়ে এসে আমাকে আদেশ প্রদান করে, তাহলে এটা আমি কী করে মেনে নিই! এখানে শুধু ফাইলে সই করার প্রশ্ন নয়, এখানে জীবন দেওয়া-নেওয়ার প্রশ্ন। আমার সর্বোচ্চ বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না।

এস আর মীর্জা : আপনারা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ে দেখেন, কোনো মুক্তিযুদ্ধেই এ রকম গণহারে জ্যেষ্ঠতা দেওয়া হয়নি। ব্যক্তিবিশেষকে তাঁদের কাজের ভিত্তিতে সম্মান দেওয়া হয়েছে। অথবা তাঁদের আর্থিক সুবিধা, জমি বা অন্য কিছু দেওয়া হয়েছে। কোনো জাতির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ রকম আর দেখা যায় না।

এ কে খন্দকার : এর সূত্রপাত হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। একজন মেজরকে যদি এক বছরের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার বা মেজর জেনারেল করা হয়, তাহলে এর খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। কারণ যেকোনো জ্যেষ্ঠতা প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। মাত্র এক বছরের মধ্যে মেজর থেকে লে. কর্নেল, লে. কর্নেল থেকে কর্নেল, কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার,

ব্রিগেডিয়ার থেকে মেজর জেনারেল—কয়েকজন মেজরের এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। এভাবে পদোন্নতি হওয়ার কথা নয়। একজন সেনা কর্মকর্তাকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করা হলে তিনি একজন ভারতীয় মেজর জেনারেলের সমান হয়ে গেলেন, এটা বড় কথা নয়। যুদ্ধের খুবই অল্প সময়ের মধ্যে যে পদোন্নতি দেওয়া হলো—এটাই হলো মূল কারণ। পরে যে জ্যেষ্ঠতার প্রশ্নটি এল, এ কারণেই এসেছিল। কারণ যাঁকে মেজর জেনারেল করা হলো, তাঁকে আর লে. কর্নেল করা যায় না। পুরো বিষয়টি মিলে সামরিক বাহিনীতে এক বিশৃঙ্খল ও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। ফলে সামরিক বাহিনীতে অসন্তোষের সৃষ্টি হলো। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এটা মুখে কেউ বলেনি। কিন্তু সবার মধ্যে এ নিয়ে অসন্তোষ ছিল। আমি এই পদোন্নতিগুলোকে সমর্থন করিনি। এমনকি আমার নিজের বেলায়ও। কারণ আমাদের ছোট সশস্ত্র বাহিনী। যে বাহিনী ২৬ মার্চ ছিল, ১৬ ডিসেম্বরে সেটাই ছিল। এর মধ্যে গুটিকয় সৈনিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন গেরিলা। অবশ্য নিয়মিত বাহিনীর জন্য কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা তখন নেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁদের সশস্ত্র বাহিনীর যে প্রশিক্ষণ, তা পুরোপুরি দেওয়া হয়নি। তাই সেনাবাহিনী এত বড় হয়ে যায়নি যে এই পদোন্নতিগুলো দিতে হবে। এই পদবিগুলোকে এভাবে বাড়াতে হবে। এই বাড়ানোর ফলে সশস্ত্র বাহিনীতে প্রায় সশস্ত্র অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এই পদোন্নতির জন্য কাজের ভেতর দিয়ে, সময়ের ভেতর দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু যুদ্ধের নয় মাসে এবং তার পরের কয়েক মাসে এমন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়নি যে পাঁচ-ছয়টি পদোন্নতি দিতে হবে।

যুব শিবির প্রসঙ্গ

মঈদুল হাসান : মুক্তিযুদ্ধের সময় যুব শিবির গঠন করা হয়। যুব শিবিরে যে অর্থ ও সাহায্যসামগ্রী বিতরণ করা হতো, সেটা কীভাবে করা হতো এবং কারা সেটা করতেন?

এস আর মীর্জা : যুব শিবিরের টাকা বিতরণ করতেন বাংলাদেশ সরকারের যুব বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ আলী নিজে। যাঁরা শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন বা ক্যাম্প চালাতেন, আসলে তাঁদের কাছেই তিনি টাকাটা সরাসরি দিতেন। আমি বা আমার সহকারী ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজা কখনোই নিজে টাকা রাখিনি বা বিতরণ করিনি।

এসব শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগের এমএনএ, এমপি অথবা আওয়ামী লীগের নেতা। অন্য কোনো ব্যক্তিকে শিবিরের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। শিবিরের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। ভারত সরকার কিছু টাকা দিত তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কিছু টাকা দেওয়া হতো অধ্যাপক ইউসুফ আলীর মাধ্যমে। তার পরও এ অর্থ পর্যাপ্ত ছিল না। বেশির ভাগ সময়ই আমাদের ছেলেরা কুমড়োর ঘন্ট আর ডাল-ভাত খেত, মাংস পেত কদাচিৎ। মাসে একবার-দুবার ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ছাগল এনে দিলেই তারা মাংস পেত। মাছ তো পেতই না। কাপড়চোপড়ও বেশি দেওয়া সম্ভব হয়নি। লুঙ্গি, শার্ট আর একটা গামছা দেওয়া হয়েছিল। গেরিলারা গামছা মাথায় বেঁধে চলত। ওরা যে মুক্তিযোদ্ধা—এটাই ওদের চিহ্ন ছিল।

গেরিলা যোদ্ধাদের ব্যাপারে আমার তখনকার একটি পর্যবেক্ষণের কথা এখন বলতে চাই। তা হলো, মুক্তিযুদ্ধে যারা যোগ দিয়েছিল, বেশির ভাগকেই তাদের মায়েরা পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধ করার জন্য। যুদ্ধের একদম শেষের দিকে কর্নেল নূরুজ্জামান একদিন আমাকে বললেন, যে সময় পাকিস্তানিরা পিছু হটছে, সেসব

জায়গা দখলে নিচ্ছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা। এই সময় কর্নেল জামান একটি মুক্ত গ্রামে এক মোড়লের বাড়িতে যান। কর্নেল জামান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুক্তিযুদ্ধে তুমি কী করেছ? মোড়ল জানালেন যে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক সাহায্য করেছেন, নানা কাজও করেছেন। ইত্যবসরে সেই মোড়ল কী কাজে বাড়ির ভেতর ঢুকলে তাঁর স্ত্রী কর্নেল জামানের কাছে এসে বললেন, 'স্যার, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না। ও রাজাকার ছিল এবং পাকসেনাদের সব সময় সাহায্য করত।' এ ঘটনা থেকে আমি বলব, আমাদের মায়েরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চরম বিপদের মধ্য দিয়েও কিছু করার চেষ্টা করেছেন, অতিপ্রিয়জনকেও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

মঈদুল হাসান : যুব শিবির শুরু হয়েছিল আগরতলায়। আপনি এটা কী অবস্থায় পেয়েছিলেন?

এস আর মীর্জা : প্রথম দিকে কীভাবে হয়েছে এটা আমি জানি না। আমি যখন যোগ দিই তখন মাহবুবুল আলম চাষী, নূরুল কাদের খান—এঁরা ছিলেন। জুনের মাঝামাঝি থেকে আমি এই দায়িত্বে যোগ দিই। আমাকে প্রথম পরিচালক করা হয়। তখন শুধু পরিচালক পদই ছিল। পরে মহাপরিচালক ও দুই পরিচালকের পদ সৃষ্টি করে আমাকে মহাপরিচালক করা হয়। ফ্লাইট লে. রেজা ও রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ বকিতুল্লাহ সাহেবকে পরিচালক করা হয়। বকিতুল্লাহ সাহেব আগরতলায় বসতেন আর রেজা কলকাতায়। আমরা ছিলাম যুব নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অধীনে। আওয়ামী সংসদীয় দলের চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছিলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। সদস্য ছিলেন ড. মফিজ চৌধুরী, এমপি সোহরাব হোসেন ও এমপি বাবু গৌরচন্দ্র বালা। ওনারাই যুব শিবিরের বিষয়টি দেখাশোনা করতেন। যুব শিবিরের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি ক্রমশ বুঝতে পারলাম, আওয়ামী লীগের নিচের স্তরে বামপন্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক অনীহা। অবশ্য যুদ্ধের একদম শেষ দিকে কিছু বামপন্থী যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমাদের কোনো যানবাহন ছিল না। এ জন্য যখন-তখন আমি যুব শিবিরগুলোতে যেতে পারতাম না। কেউ গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেত। যখন এমএনএ-এমপি বা রাজনৈতিক নেতারা আসতেন, তখন তাঁদের কাছে শিবির সম্পর্কে খবর বা শিবিরে কতজন আছে তার তালিকা পেতাম। আমর মূল কাজ ছিল ভারতের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালযের অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। আসলে পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগই আমাদের যুব শিবিরগুলোকে সহযোগিতা দিত। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমার সহযোগী হিসেবে ছিলেন।

মঈদুল হাসান : কোনো যানবাহন ছাড়াই আপনাকে ১৪০০ মাইল সীমান্তজুড়ে স্থাপিত যুব শিবিরগুলো দেখাশোনা করতে হয়েছে। তারপর যুব শিবিরে সবাইকে রাখা যাচ্ছিল না বলে যুব অভ্যর্থনা শিবির করতে হলো। যুব শিবিরের সংখ্যা ছিল ৩০, অভ্যর্থনা শিবিরের সংখ্যা ছিল ১০০। এর কোনোটিতেই যাওয়ার মতো ভালো একটা যানবাহন আপনাকে দেওয়া হয়নি। তাই আপনি কাজ করতেন ওই সব জায়গার এমপিএ এবং এমএনএদের মৌখিক খবরের ওপর ভিত্তি করে। তাঁরাই এর দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরা যখন কলকাতায় আসতেন তখন আপনি তাঁদের কাছে খবর পেতেন। এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার মতো ন্যূনতম সাহায্য-সহযোগিতা আপনি পাননি। এ থেকে বোঝা যায় আমাদের নেতৃত্বের ব্যর্থতার দিকটি। যদিও সঠিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বাছাই করার জন্য যুব শিবিরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আপনাকে দেওয়া সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা থেকে বুঝতে পারা যায়, কতটা অসংগঠিত ছিল এই যুব শিবিরগুলোর ব্যবস্থাপনা।

এস আর মীর্জা : যানবাহনের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও কয়েকটি এলাকা আমি পরিদর্শন করেছি। ভারতীয় দিক থেকে আমার যে সহযোগী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে এবং অন্য আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি। বিশেষত ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল যখন কোথাও যেতেন, তখন আমাকে তাঁর সঙ্গে নিতেন। শিলংসহ আরও দু-তিনটি এলাকা এবং ৬ ও ৭ নম্বর সেক্টর এলাকা আমি পরিদর্শন করেছি।

এ কে খন্দকার : শিবিরে এমএনএ-এমপিদের মূলত কোনো কাজ ছিল না। যুবকদের সঙ্গে মেলামেশা করাই ছিল তাঁদের মূল কাজ। এমএনএ-এমপিরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হলে ছেলেদের মধ্য থেকে তাঁরাই বাছাই করে দিতেন। আর সদর দপ্তরে এসে তাঁদের জন্য টাকা-পয়সা নিতেন। এর বাইরে তাঁদের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না। এসব এমএনএ-এমপিরা সবাই যে যুব শিবিরে থাকতেন তা নয়। কিছু এমএনএ-এমপি থাকতেন। যাঁরা থাকতেন তাঁদের প্রধান কাজ ছিল নিজ নিজ এলাকার ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারা, তাদের খোঁজখবর নেওয়া এবং তাঁদের আশ্বাস দেওয়া যে মুক্তিযুদ্ধ ভালোভাবে চলছে, এটা সফল হবে। মূলত উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়টির ওপরই সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটাও ছিল নামেমাত্র। এ বিষয়ে দু-একটি বক্তব্য দেওয়া হলেও তা ছিল খুবই দুর্বল। এটা তেমন কার্যকর ছিল না।

এস আর মীর্জা : যুব শিবিরের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের নীতি ও কৌশল নামের একটি পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছিল। তাতে একটা নীতিমালা ও কী কী করণীয়, তা লেখা ছিল।

এ কে খন্দকার : যুব শিবিরের দায়িত্বপ্রাপ্তদের মূল কাজ ছিল ছেলেপেলেদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়গুলো দেখা, তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো ছেলেগুলো বাছাই করা, তাদের নিয়ে দৈনিক একটা মিটিং করা—এসব কাগজে লেখা ছিল। কিন্তু আমি যেসব শিবিরে গিয়েছি, সেগুলোর দু-একটায় এসব করা হতো, বেশির ভাগ শিবিরেই তা করা হতো না।

শিবিরগুলো পরিচালনা বা তাদের কীভাবে পরিচালনা করা হবে, এ সম্পর্কে একটা নির্দেশনা ছিল। কিন্তু আমি বলেছি বাস্তবতার কথা। বাস্তবে কিছু শিবিরে কয়েকজন এমএনএ-এমপি এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ শিবিরে এগুলোর কিছুই হতো না। মাসের পর মাস এসব ছেলেকে উজ্জীবিত রাখা ছিল একটা পূর্ণকালীন কাজ। এটা বড় একটা কাজ। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে তরুণদের একটা অংশ এসেছিল আত্মরক্ষার তাগিদে। কিন্তু বড় অংশটিই এসেছিল যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ স্বাধীন করার জন্য। এটা আমার অভিজ্ঞতা। আমি ছোট একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একদিন রাত ১২টা কি সাড়ে ১২টার দিকে একটি শিবিরে পৌঁছালাম। সময়টা ঠিক মনে নেই। সে সময় অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। একটা খোলা মাঠ। এক স্থানে একটা তাঁবু টানানো। সারা মাঠ কাদা। ওখানে ৩০০-৩৫০ জন মানুষ। ছাত্র, শিক্ষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, কৃষক, শ্রমিক—সব পেশার মানুষই আছে। আমি যখন গেলাম তখন তারা খাচ্ছে। সবাই খাচ্ছে ঠান্ডা ভাত আর ঠান্ডা ডাল। খাচ্ছে মাটির পটে করে। কাদায় বসতে পারছে না। দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। এ অবস্থায় একটি ছেলে আমার কাছে জানতে চাইল, কবে নাগাদ সে প্রশিক্ষণে যেতে পারবে। ওই অবস্থায়ও কারও কাছ থেকে কোনো অভিযোগ আমি পাইনি। সুতরাং এমএনএ-এমপিরা কী করেছেন না করছেন সেটা আলাদা কথা। কিন্তু সাধারণ ছেলেরা এটাকে বড় করে দেখেনি। তারা যুদ্ধ করতে গিয়েছিল।

মঈদুল হাসান : প্রথম থেকেই অবস্থাটা ও রকম ছিল। এপ্রিলেই আগরতলায় যখন অনেক তরুণ এল, বিশেষ করে ছাত্রলীগের ছেলেরা, তখন তারা কোথায় অস্ত্র পাবে, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাজ করতে পারবে কি পারবে না—এই প্রশ্নগুলো ওঠে। এরই আলোকে প্রথমেই আগরতলায় যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়, সেটা হলো একটা যুব শিবির করতে হবে। এর জন্য কতগুলো নিয়মনীতি ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন মাহবুব আলম চাষী। আমি তাঁর হাতে লেখা কাগজগুলো দেখেছিলাম। ড হবিবুর রহমান (ছদ্মনাম ছিল ড. আবু ইউসুফ) যুব প্রশিক্ষণের জন্য সিলেবাস তৈরি করেছিলেন বলে শুনেছি। এদের সঙ্গে আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং আরও কয়েকজন তরুণ ছিল। তারা একত্রে কাজ করেছে। বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে যেসব তরুণেরা সীমান্ত অতিক্রম করে এসেছে এবং তারা একটা টগবগে ধারণা নিয়ে এসে বলছে, এক্ষুনি আমাদের অস্ত্র দাও, আমরা যুদ্ধ করব। অস্ত্র তো কেউ নিয়ে

বসে ছিল না। এরা ধরেই নিয়েছিল, এলেই ভারত সরকার তাদের অস্ত্র দেবে। তা তারা পায়নি। এ অবস্থায় তরুণদের মধ্যে একটা হতাশা শুরু হয়। তখন ঠিক হয়, এটা জুন মাসের দিকে, যে এই ছেলেদের যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হবে। সে জন্য তাদের কিছুসংখ্যক শিবিরে আশ্রয় দিতে হবে এবং সেখানে তাদের ধরে রাখতে হবে। এটাই হলো যুব শিবিরের প্রথম ধারণাটা। পুরো ব্যাপারটাই করা হয় উপস্থিত বুদ্ধির ওপর ভরসা করে।

প্রথম দিকে গেরিলা বা মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি ছিল না। দুই থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত। কিন্তু ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পর ভারত যখন তার আঞ্চলিক নিরাপত্তা, বিশেষ করে চীনের সম্ভাব্য সামরিক হামলা মোকাবিলার বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়, তখনই ভারত সিদ্ধান্ত নেয় যে এর পর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক হারে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া যেতে পারে। বস্তুত এই চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে প্রতিমাসে ২০ হাজার করে মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেয় ভারত। আসলে কোনো রাষ্ট্রই তার নিজের নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষা করে অন্যকে সাহায্য করার কথা ভাবতে চায় না। ভারত তার নিরাপত্তার বিষয়টি এভাবে দেখত, মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, তাতে পাকিস্তান হয়তো একটা সময় ভারত আক্রমণ করতে পারে এবং এই আক্রমণে তারা চীনকে শামিল হওয়ার ব্যাপারে সম্মত করাতে পারে। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত যদি চীনের চলাচলের উপযোগী থাকে, তাহলে সে অবস্থায় ভারতকে হয়তো তিনটি ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে হতে পারে। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব—এই তিন দিকে একযোগে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তাদের নিরাপত্তা ভাবনার মধ্যে রাখে। কিন্তু সেই ভয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও তারা অগ্রাহ্য করতে পারেনি। বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়ই ছিল পাকিস্তানিদের দখল অবসানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এই লক্ষ্যে তাদের নিজেদের প্রবল এক জনমত ছিল মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার পক্ষে। অন্যদিকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে সমরাস্ত্র দাও, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও, দ্রুত যুদ্ধ ঘোষণা করো—এসব চাপ ছিল ভারত সরকারের ওপর।

চীনকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে ৯ আগস্ট ভারত সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে। এর পরই ভারত শরণার্থীদের বিপুল চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে।

গেরিলা তৎপরতা

এ কে খন্দকার : জুন-জুলাই মাসের দিকে আমাদের মধ্যে একটা হতাশার ভাব এসেছিল। এই সময় আমরা কিন্তু অন্য একটা দিকে আক্রমণ কর্মকাণ্ড বা তৎপরতা করতে পেরেছিলাম, ফলে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি চলে যায়, আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সেই কর্মকাণ্ড ছিল আমাদের নৌ-কমান্ডোদের আক্রমণ। নৌবাহিনী গঠন সম্পর্কে এর আগে একটু বলেছি। মে মাসে ভাগীরথীর তীরে আমাদের এই নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণের শিবিরপ্রধান, প্রশিক্ষক—এঁরা সবাই ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর। যদিও বিষয়টি কর্নেল ওসমানী জানতেন, আমি জানতাম এবং অন্য দু-চারজন জানতেন কী উদ্দেশ্যে এই বাহিনী গঠন করা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব ছিল সরাসরি ভারতীয়দের হাতে। যদিও তারা আমাদের অধীন বা বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরের অধীন ছিল, কিন্তু তাদের জন্য যে প্রশিক্ষণ, তারা কীভাবে আক্রমণ পরিচালনা করবে, তার পরিকল্পনা, কর্মসূচি ইত্যাদি যা করা হতো, তার সবটাই ছিল ভারতীয়দের হাতে। ১৫ আগস্ট যে আক্রমণ তৎপরতা আমাদের নৌ-কমান্ডোরা চট্টগ্রাম, চালনায় করল, যার ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যে হতাশা বিরাজ করছিল, সেটা অনেকটা কাটতে শুরু করে। এরপর অক্টোবর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন করে যে গেরিলা তৎপরতা শুরু হলো, এটাকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা কতটা জোরদার ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পাকিস্তানিদের তৎপরতা ও কর্মকাণ্ডের খবর শুনে। পাকিস্তানিদের যত নিহত সেনা ছিল, তাদের পাকিস্তানে নিয়ে যেত পাকিস্তান বিমানবাহিনী ও পিআইএ। সশস্ত্র বাহিনীতে একটা নিয়ম আছে যে সেনাসদস্যদের, কর্মকর্তা তো বটেই সাধারণ সৈনিকদের লাশ বা

মৃতদেহ যে করেই হোক পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং এটা তাদের অবশ্যকর্তব্য ছিল। কিন্তু পরে, বিশেষত অক্টোবর থেকে নিহত পাকিস্তানি সৈন্যের সংখ্যা এমন পর্যায়ে গেল যে এত মৃতদেহ তাদের পক্ষে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। এর আরেকটা প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানে পড়েছিল। তারা সেনাদের মৃতদেহ বাংলাদেশ থেকে লাহোর কিংবা করাচি অথবা অন্য কোনো স্থানে নিয়ে যেত। এতে সেখানে প্রবল জনরোষের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল। জনতা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পেত, সবকিছু যদি স্বাভাবিক থাকে, তাহলে এত মৃতদেহ কেন? এসব কারণে পরবর্তী সময়ে নিহত পাকিস্তানিদের পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

অক্টোবরের শেষের দিকে এবং নভেম্বরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধা বা গেরিলাদের তৎপরতা প্রচণ্ড রকম বেড়ে যায় এবং যার ইতিবাচক ফল ফলতে শুরু করে। এ সময় পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি স্থানেই প্রচণ্ড রকমের মার খায় এবং প্রচণ্ড হতাহতের শিকার হয়ে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের এ সময়টাকে আমি বলব সবচেয়ে উজ্জ্বল সময়।

মঈদুল হাসান: আমি খন্দকার সাহেবের কথাটাকে একটু অন্যভাবে বলতে চাই। গেরিলা বা মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানিদের যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি করেছে, এগুলো আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় এসেছে। ধরতে গেলে জুলাই থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে আন্তর্জাতিক পত্রিকাগুলোয় এসবের প্রচার ছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে অক্টোবরের আগে, আমাদের জন্য অবস্থা ততটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। গেরিলা বা মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে বাংলাদেশে প্রতিপক্ষের বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহত খুব বেশি করা যায়নি। একমাত্র নৌ-কমান্ডোদের তৎপরতা ছাড়া আমাদের তেমন কোনো বড় সাফল্য নেই।

আরেকটি বিষয়, আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা যে সবাই মুক্তিযুদ্ধের কাজ করতে পারতেন, এমন ধারণা বা উপলব্ধি আমার ছিল না। তাঁদের কতগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য দেওয়া হতো বটে। কিন্তু আক্রমণ বা তৎপরতাগুলো তাঁরা করতেন না। আমাদের সদর দপ্তর থেকেও লক্ষ্যগুলো কখনো কখনো যেত না। লক্ষ্যবস্তুর তালিকা তৈরি হতো ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামে, মুক্তিবাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত ডিরেক্টর অপারেশনস্ মেজর জেনারেল বি এন সরকারের কার্যালয় থেকে। সেপ্টেম্বর থেকে তিনি আগ্রহ নিয়েই প্রত্যেক মাসের লক্ষ্যবস্তুর তালিকা করতেন। এই তালিকা নিয়ে তিনি কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করতেন। তিনি কথা বলতেন এ কে খন্দকারের সঙ্গে এবং আলাদাভাবে আমার সঙ্গে। তিনি সপ্তাহে একবার করে দেখা করতেন আমার সঙ্গে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ অবধি লক্ষ্যবস্তু তৈরি-সংক্রান্ত

কাজে এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। এই লক্ষ্যবস্তু চূড়ান্ত করে তার কয়েকটি অনুলিপি করা হতো। একটি অনুলিপি পাঠানো হতো বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরে সরাসরি ওসমানী সাহেবের কাছে। আরও দুটি পাঠানো হতো, একটি পাঠানো হতো বাংলাদেশ সেক্টর অধিনায়কদের কাছে, আর একটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফরমেশন অধিনায়কদের কাছে। সেক্টর অধিনায়কদের ওপর চাপ রাখা হতো লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ লক্ষ্যবস্তু দিলেই তো চলবে না, সেই লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত বা আক্রমণ করার জন্য সেক্টর অধিনায়কদের বিস্তারিত যুদ্ধ বা আক্রমণ পরিকল্পনাও করতে হবে এবং বাস্তবায়িত করার দায়িত্বও নিতে হবে তাঁকে। কিন্তু যখনই তাঁরা ব্রিগেড গঠন করতে শুরু করলেন, তখনই এই তৎপরতাটায় স্থবিরতা দেখা দিল। ব্রিগেড গঠনে একজন সেনা কর্মকর্তার যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তা আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের কারও ছিল না। ব্রিগেড তো দূরের কথা, একটা ব্যাটালিয়ন চালানোর মতো অভিজ্ঞতাও তাঁদের সবার ছিল না। কারণ, তাঁরা ছিলেন সবাই মেজর পদের কর্মকর্তা। সেনা বাছাই করা, প্রশিক্ষিত করা, সেনা কর্মকর্তা সংগ্রহ ও তৈরি করা, অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা, তারপর যুদ্ধ বা আক্রমণ পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন—এর প্রতিটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ একেকটি কাজ। এই সমুদয় কাজ কার্যত উপেক্ষা করে তাঁরা প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে চেষ্টা করেছেন কার ব্রিগেডটা কত বড় হবে। ব্রিগেড গঠন সম্পর্কে এর আগেও আমরা সংক্ষেপে কিছু কথা বলেছি। এর পরও এ সম্পর্কে আরও বলার আছে।

ওসমানী সাহেব তাঁর একটা নতুন যুদ্ধ-পরিকল্পনার মধ্যে ব্রিগেড গঠনের বিষয়টি রেখেছিলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার কোনো মূল্য ছিল না। এ সম্পর্কে লিখিত কোনো কিছু পাওয়া গেছে বলে আমি জানি না। এটা ছিল সম্ভবত তাঁর মনগড়া। একটা নিয়মিত বাহিনীতে যেভাবে সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়, তার কোনোটিই এ ক্ষেত্রে ছিল না। অর্থাৎ সে জন্য না ছিল অর্থবল, না ছিল লোকবল, না ছিল তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, না ছিল তাঁর কারও সঙ্গে আলাপ করার মনোবৃত্তি। যিনি যুদ্ধ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করার ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন, অর্থাৎ বাংলাদেশ বাহিনীর উপপ্রধান এ কে খন্দকার, তাঁর সঙ্গে তিনি কখনোই এই যুদ্ধ বা আক্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলাপ করতেন বলে শুনিনি। ওই অবস্থায় ওসমানী জুলাই মাসে ঘোষণা করলেন যে একটি ব্রিগেড গঠন করবেন। আগস্ট মাসে তিনি ঠিক করলেন আরও দুটি ব্রিগেড গঠন করবেন। অক্টোবর মাসে এসে তিনি আবার সবগুলো ব্রিগেড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত দিলেন। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তুরা ব্রিগেড অর্থাৎ জেড-ফোর্স ঠিকই থেকে গেল। ওসমানীর নির্দেশ জিয়াউর রহমান মানলেন না এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে খালেদ মোশাররফও কিন্তু তাঁর নতুন ব্রিগেড গঠনের প্রক্রিয়া শেষ করলেন। আর যিনি

একটু ধীরেসুস্থে করতে গিয়ে ঠিকভাবে পারলেন না, তিনি হচ্ছেন কে এম সফিউল্লাহ। এ জন্য তিনি খানিকটা নির্ভর করেছিলেন কর্নেল ওসমানীর ওপর। ওসমানী তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনিই এর জন্য লোক এনে দেবেন সিলেট থেকে। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। অবশ্য সবশেষে তাঁকে সিলেট থেকে কিছু লোক দেওয়া হয়, যার অধিকাংশই ছিল আনাড়ি। তুরাতে কিন্তু জিয়াউর রহমানের ব্রিগেড তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

যা-ই হোক, যুদ্ধ-পরিকল্পনা করার এবং তা বাস্তবায়নের যে দায়িত্ব, সেটা পালন করার সময় তাঁদের না থাকলেও চাপটা তো থাকত। চাপটা আবার সব সময় তাঁদের ওপর ক্রিয়াশীল থাকত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফরমেশন অধিনায়কদের মাধ্যমে। এ সময় ভারতীয়রা চাপ দিত এই কারণে যে, তারা ভেবেছিল পরবর্তী যুদ্ধে তাদের অংশ নেওয়ার ভিত্তিটা বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের দিয়েই করিয়ে নিতে হবে। শরণার্থীদের তো পাকিস্তানিদের পরাজিত করেই ফেরত পাঠাতে হবে। ভারতীয় অধিনায়কদের এই চাপটা নিয়ে তখন তিক্ততারও সৃষ্টি হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ে যুগ্ম কমান্ড গঠিত হলে তিক্ততা হ্রাস পেতে শুরু করে।

আসলে অনেক অতিরিক্ত কাজ আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের করতে হতো একই সময়ে। যেমন—এক. যুদ্ধ বা আক্রমণ চালানোর একটা চাপ থাকত; দুই. ব্রিগেড গঠনের মতো দুঃসাধ্য কাজ ছিল; তিন. নতুন গেরিলা বা মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ নিজ সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত করে দেশের ভেতরে পাঠানোর চলমান কাজ। যদি আমরা ধরে নিই ২০ হাজার করেই প্রতিমাসে প্রশিক্ষিত ছেলে আসছে এবং তা থেকে যদি অন্তত ৭৫ শতাংশ গেরিলা যোদ্ধাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠাতে হয়, তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়াল ১৫ হাজারে। আগে যারা গিয়ে ফিরে এসেছে, তারা আবার যারা যেতে চায়—এ রকম বারবার আসা-যাওয়ার ব্যাপারও তো ছিল। এত মুক্তিযোদ্ধাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দিয়ে, কাজের পরিকল্পনা দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী সেক্টর অধিনায়কদেরই মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দেওয়ার কাজটি করতে হতো। এটাও একটা অতিরিক্ত কাজ ছিল।

এ কে খন্দকার : মঈদুল হাসান সাহেব যেসব কথা বললেন, এর অনেকটাই যথার্থ। তবে তাঁর কথার কিছু সংশোধনী আনব। ব্রিগেড আসলে ভেঙে দেওয়া হয়নি। কর্নেল ওসমানী মুখে বলেছিলেন, ব্রিগেড ভেঙে দাও এবং সেটাতে তিনি স্থিরও ছিলেন। এখানে আরেকটি মনে রাখার মতো বিষয়, তা হলো—সদর দপ্তর যখন বলছে তোমাদের ব্রিগেড নেই, ব্রিগেড ভেঙে দাও—তখন সেই ব্রিগেডের আর কোনো কার্যক্রম থাকে না। বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর ব্রিগেডের অস্তিত্বকে

স্বীকার না করলে তার আর ব্রিগেড হিসেবে কাজ করার কোনো সুযোগ থাকে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথাও বলেছি।

তবে এ কথা সত্য যে ব্রিগেডের অধস্তন সেনা কর্মকর্তারা কাজ করতেন, যোদ্ধাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তাদের লক্ষ্য ঠিক করে দিতেন—বলা যায় সেনা কর্মকর্তাদের বেশ খানিকটা অবদান ছিল এক্ষেত্রে। তবে কতটা অবদান ছিল, সেটা অবশ্য বলা মুশকিল। এ অবস্থায় ব্রিগেড সমস্যাটা এমন দাঁড়াল যে সত্যিকার অর্থে না একটা ব্রিগেড হলো, না সেটা থাকল, না সেটা ভাঙল। এক অদ্ভুত অবস্থায় এগুলো থাকল। তিনটি ব্রিগেডই কিন্তু কিছু না কিছু যুদ্ধ করেছে। আমি একটি যুদ্ধের কথা বলতে পারি, যেখানে জিয়ার ব্রিগেড অংশ নিয়েছিল। সেটা ছিল কামালপুরে। ৩১ জুলাই থেকে ১ আগস্টের এ যুদ্ধে একজন সেনা কর্মকর্তাসহ ৩০ জন যোদ্ধা নিহত হন। তাঁদের মধ্যে সৈনিক যেমন ছিলেন তেমনি গেরিলা যোদ্ধাও ছিলেন। অন্যদিকে দুজন সেনা কর্মকর্তাসহ ৬৬ জন সৈনিক ও গেরিলা যোদ্ধা আহত হন। যখন জেনারেল ওসমানী এ খবর জানলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'স্যাক হিম।' সেই সময় আমি তাঁর সামনেই ছিলাম। বস্তুত তিনি মেজর জিয়াকেই পদচ্যুত করার কথা বলেছিলেন। আমি জানি না, তবে হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে জিয়ার জন্যই এই আক্রমণ-পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। তখন যদিও ওসমানী বা আমি ওই আক্রমণ বা যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানি না। সেই সময় প্রথম ব্রিগেড অধিনায়ককে পদচ্যুত করার ব্যাপারটি আমাদের মনোবলের জন্য খুব একটা ভালো হবে না বলে আমার মনে হয়েছে। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে, জেনারেল ওসমানীকে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, 'স্যার, এ কাজ করবেন না। এখন এটা করার সঠিক সময় নয়।' আমার এ কথার পর তিনি তখনই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন। পরে এ সম্পর্কে আর কোনো তদন্ত করা হয়নি যে কার জন্য, কার দোষে এত মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এটা সত্য, যেখানে তারা আক্রমণ করেছিল, সেই লক্ষ্যবস্তুটা ছিল অসম্ভব রকমের শক্তিশালী। ওখানে পাকিস্তানি বাহিনী বিরাট একটা শক্তি নিয়ে অবস্থান করছিল। তার পরও যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছাড়াই জেড-ফোর্স অধিনায়ক জিয়াউর রহমান অনেকটা বাধ্য করেছিলেন প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে এই যুদ্ধে যেতে। জিয়াউর রহমান নিজে কখনো যুদ্ধে নামেননি, এমনকি ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে কখনো বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও যাননি—কামালপুর যুদ্ধের সময় তিনি ভারতের মাটিতেই নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছিলেন—এ কথা জিয়ার ব্রিগেডের অনেক ছেলেই সে সময় বলেছিল। আসলে জিয়াউর রহমান বরাবরই ভারতের মাটিতে অবস্থান করেছেন। এ কথাটা কিন্তু সত্য।

মঈদুল হাসান : গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে যে কথা বলা হচ্ছিল, এ সময় হাজার হাজার গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সেক্টর অধিনায়কেরা দেশের ভেতরে তাদের পাঠাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আমার কথা ছিল যে সেক্টর অধিনায়কদের ওপরে এত সব দায়িত্ব থাকতে গেরিলা যোদ্ধাদের ঠিকভাবে নিজ নিজ সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত করে দেশের ভেতরে পাঠানো, তারপর কী কাজ হলো সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, তাদের আর কী জনবল, অস্ত্রশস্ত্র বা রসদ দরকার তা দেখা—এসব কাজ সুসংঘবদ্ধ বা সুশৃঙ্খলভাবে করা হয়নি। একই সময় ব্রিগেড গঠনের ফলে পুরো ব্যাপারটিই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

এ কে খন্দকার : সুসংঘবদ্ধ বা সুশৃঙ্খল বলতে আমি যেটুকু বুঝি—সত্যিকার অর্থে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে, সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল ধরে এটা সব ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু তার পরও বলব, যেহেতু এতগুলো এনসিও, একটা ব্রিগেড ফরমেশনে এক-তৃতীয়াংশ শক্তি থাকলেও প্রতিটা ব্রিগেডেই বেশ কিছু এনসিও ছিল—সিনিয়র সার্জেন্ট, হাবিলদার, সুবেদার—এরা সংখ্যায় অনেক ছিল। অধস্তন সেনা কর্মকর্তা কিছু ছিল—যেমন লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার সেনা কর্মকর্তা। অন্যদিকে নন-কমিশন সেনা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকেও অনেকে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব নিয়েছিল। তারা নিজেরা গেরিলাদের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে গেছে এবং বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই তারা কাজ করেছে। এ কথা আমি বলতে পারি যে অক্টোবর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি, অধিক সংখ্যায় অস্ত্রশস্ত্র প্রদান, সেই সঙ্গে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। সব পর্যায়ে উৎসাহ-উদ্দীপনাও দেখা যায়। বিশেষ করে নন-কমিশন সেনা কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, আর তারা দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়ায় গেরিলারা বিশেষভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এর ফল পেতে শুরু করলাম আমরা। দেশের অভ্যন্তরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এমন শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল যে পাকিস্তানি সেনারা—সেনাবাহিনীতে একটা কথা আছে, 'মিলিটারি ব্লাইন্ডনেস' বা সামরিক অন্ধত্ব, অর্থাৎ আমি যদি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে বা এক ঘর থেকে আরেক ঘরে না যেতে পারি, তাহলে আমার যে অক্ষমতা—এর ফলে আমি জানব না যে অমুক স্থানে কী আছে, অর্থাৎ গোয়েন্দা ও অন্যান্য তথ্য জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবো। ফলে সীমান্তঘাঁটি কিংবা সেনানিবাস বা কোনো শিবির থেকে বেরোতে যেখানে ১০ জন সেনার দরকার, সেখানে তারা ২০ জন নিয়ে বের হতো এবং ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল, তখন তারা আর বাইরে বেরোতেই পারত না। কারণ তাদের সব সময় ভয় ছিল—এই বোধহয় কোথাও গেরিলা বা মুক্তিবাহিনী ফাঁদ ফেলে ওত পেতে রয়েছে। এই যে তারা বেরোতে পারল না, গোয়েন্দা ও অন্যান্য তথ্য

জোগাড় করতে পারল না তাদের অবস্থানের বাইরে, এর ফলে তারা যুদ্ধ না করে পালাতে শুরু করল। যশোরের দিকে ভারতীয় বাহিনী শুধু পদযাত্রা করেছে, যুদ্ধ করতে হয়নি। ওখানে পাকিস্তানিরা বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেল। শুধু কয়েকটি জায়গায় বড় রকমের যুদ্ধ হয়েছে—যেমন হিলি, সিলেট, ভৈরব। কিছু জায়গায় যুদ্ধ হয়েছে। পাকিস্তানিরা বেশির ভাগ পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। বাংলাদেশে কোথায় কোথায় আক্রমণ করা হবে বা কোন কোন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা হবে, তা নিয়ে আমার সঙ্গে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা ও অন্যরা নিয়মিত আলাপ-আলোচনা করত এবং এসব লক্ষ্যবস্তু অবশ্যই বড় ছিল। আবার সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন লক্ষ্যবস্তুও বেছে নেওয়া হতো। বড় বলতে, যেমন আদমজী পাটকল, এটাকে ধ্বংস করা হবে, নাকি হবে না, এমন ক্ষেত্রে আমি তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলোচনা করতাম, সিদ্ধান্ত চাইতাম। কারণ অর্থনৈতিক বা সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থাপনা বা লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করে তা ধ্বংস করতে হলে কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় বা অনুমতি লাগে। একজন জেনারেল নিজেই এটা ঠিক করতে পারেন না, যদি না এমন অবস্থা হয় যে আর কোনো উপায় নেই। শুধু এমন ক্ষেত্রেই সেনানায়কেরা সিদ্ধান্ত নেন তাৎক্ষণিকভাবে। এভাবে আলাপ-আলোচনা করেই আমরা এগোতাম। যুদ্ধ বা আক্রমণ পরিকল্পনা বলতে যেটা বোঝায়, সেটা আমাদের বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে সেভাবে কখনো করা হয়নি, এটা সত্য কথা।

মঈদুল হাসান : ভারতের বড় ঝুঁকি বা বিপদ ছিল ৯০ লাখ শরণার্থীকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে। কারণ শরণার্থীদের বোঝা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ধারণ করা বা বয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাদের সমাধান করতে হবে। শীতকালে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বন্ধ হয় বরফে। তখন চীনাদের পক্ষে আক্রমণ করা সম্ভব নয়। শীতকালে পাকিস্তানিদের পরাভূত করে বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানোর উপযুক্ত সময়। সেটাকে মনে রেখেই ভারত কিন্তু তাদের একটা সামগ্রিক সামরিক ও অন্যান্য কৌশলগত পরিকল্পনা করেছিল। যুদ্ধের এই কৌশল অনুযায়ীই তারা কাজ করে গেছে। তাদের সেই যুদ্ধকৌশলের কতগুলো প্রধান ধাপ ছিল। একটা ছিল চীনের সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করা। দ্বিতীয় ধাপে ভারত নিজেও যাতে শরণার্থী ফেরত পাঠানোর শেষ উপায় হিসেবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে পারে, সে জন্য সেপ্টেম্বরের শেষে মস্কোয় সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ও তার আশু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের সম্মতি আদায় করেন। তারপর ভারত সামরিক

সাহায্য ও চাপ আরও বাড়িয়ে দেয় আমাদের গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতরে ঢোকানোর জন্য। কিন্তু তার পরও যখন দেখে, তাদের নিজেদের সামরিক পরিকল্পনা অনুপাতে তা যথেষ্ট নয়, তখন তারা নিজেরাই অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সীমান্তে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে তারা সরাসরি পাকিস্তানকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে। এ জন্য তারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরও সঙ্গে নিয়েছে, যেসব জায়গায় তারা পেরেছে। যেমন—বিলোনিয়া, সালদা নদীর যুদ্ধ। এখানে ভারত-বাংলাদেশ যৌথভাবে লড়াই করেছে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। বেশ বড় ধরনের লড়াই হয় এসব জায়গায়। আবার কতগুলো জায়গায় যুদ্ধ ততটা হয়নি। যেমন—তুরা অঞ্চলে তেমন কোনো যুদ্ধ হয়নি, যেখানে দায়িত্বে ছিলেন জিয়াউর রহমান।

জেনারেল বি এন সরকারকে তাজউদ্দীন আহমদ সেপ্টেম্বরে বলে দিয়েছিলেন যে তিনি যেহেতু অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, সে জন্য খুব জরুরি না হলে মঈদুল হাসানের কাছে রুটিন রিপোর্টগুলো পেশ করতে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বলছি, যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয়ের জন্য সেক্টর অধিনায়ক পর্যায়ে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশের সেক্টর অধিনায়ক এবং ভারতীয় ফরমেশন অধিনায়কদের মধ্যে খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্যই বেতার সংযোগগুলো দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দু-একটি স্থানে এই বেতারযন্ত্রের সুইচ অনেক সময় বন্ধ রাখা হতো। ফলে ভারতীয় ফরমেশন অধিনায়কেরা বাংলাদেশের সেক্টর অধিনায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারতেন না। আবার কোনো কোনো জায়গায়, যেমন মেজর গাফফারের সঙ্গে এই যোগাযোগটা ভালোভাবেই রাখা সম্ভব হয়েছিল। সেখানে আমাদের যোদ্ধারাও খুব ভালো লড়াই করেছিল। উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ভালো সম্পর্কের কারণেই যুদ্ধক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র—সব ক্ষেত্রেই এ সময় ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটেছিল। যুদ্ধ-পরিকল্পনা প্রণয়নেও।

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে যুদ্ধ তৎপরতা শুরু করে। তার পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যে কতগুলো সেনানিবাস ও সেনাঘাঁটি অবলম্বন করে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে গড়ে তুলেছিল, তাদের সেখান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিশাল সীমান্তে, অর্থাৎ ১৪০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্তে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা। পাকিস্তানিরা এই ফাঁদে পা দিল। তারা তখন আর সংঘবদ্ধ শক্তি থাকতে পারল না। ছোট্ট ছোট্ট দলে পরিণত হলো। এরপর তাদের আর কোনো সংঘবদ্ধ জোর ছিল না। এটা সম্ভব হয় ভারতীয়দের সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত যুদ্ধ-পরিকল্পনার কারণে। পাকিস্তানিরা সীমান্ত অবধি এগিয়ে যাওয়ার দরুন দেশের অভ্যন্তরে এক ধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হলো। এই সুযোগে গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধারা ব্যাপকভাবেই দেশের ভেতর ঢোকে এবং

তাদের বেপরোয়া তৎপরতার মাধ্যমে পাকিস্তানিদের অনিশ্চয়তা বোধকে গভীর থেকে গভীরতর করে তোলে। এক সীমান্ত থেকে আরেক সীমান্তে যাওয়ার ক্ষমতা পাকিস্তানিরা হারিয়ে ফেলে। খন্দকার সাহেব যেটা বলেছেন, সামরিক অন্ধত্বের ফলে যে প্রতিক্রিয়া হলো। পাকিস্তানের তখন চিন্তা ছিল পূর্বাঞ্চলের সম্ভাব্য বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় কাশ্মীরের একটা অংশ তারা দখল করে নেবে। সে জন্য পশ্চিম পাকিস্তানেও তাদের বাহিনীর বিরাট অংশকে রাখতে হয়েছিল। তারপর তাদের যেটুকু উদ্বৃত্ত ছিল—সেটা দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে সেনানিবাস, জেলা শহর, গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র ও সীমান্তগুলো একই সঙ্গে সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। বিশেষভাবে অক্টোবরের শেষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের যে লড়াইটা ভালোভাবে শুরু হলো পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে, তখনই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মবিশ্বাস দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার দ্রুত বৃদ্ধি কেবল তাদের নিজেদের সংখ্যা ও অভিজ্ঞতা বাড়ার ফলে ঘটেনি, সীমান্ত অতিক্রমের জন্য এটা ছিল ভারতের সুচিন্তিত সামরিক পরিকল্পনার নানামুখি কৌশলের একটি অংশ—যেটা তারা কার্যকর করে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর আরেকটা ব্যাপার তখন আমার চোখে পড়েছিল। যখন কোনো কৌশল বা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতো না, তখন তারা আবার সেটা থেকে নতুন কৌশল তৈরি করত। যেমন হিলির যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর তারা ভাবল যে সব জায়গায় পাকিস্তানিদের তারা কাবু করতে পারবে না। তখন ডি পি ধর কলকাতায়। তিনি নভেম্বর মাসে বোধহয় ১৭ তারিখে আমাকে বললেন, আমরা এখন কৌশলে কিছুটা পরিবর্তন করেছি, এখন থেকে পাকিস্তানিদের শক্ত অবস্থানগুলো এড়িয়ে আমরা অন্য পথে এগিয়ে যাব ঢাকার দিকে। এটা ছিল তাদের একটা বড় কৌশলগত সিদ্ধান্ত—যা তাদের দ্রুত সাফল্য এনে দিয়েছিল। যখন পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হলো, তখন তারা প্রথমেই দ্রুত এগোতে পেরেছিল ঢাকার দিকে। তা সত্ত্বেও তাদেরও নানা রকম গণ্ডগোল হয়েছিল, এভাবে এগোনোর পরও। যেমন যশোর দিয়ে ঢোকার পর, তারা তো প্রথম এগিয়ে আসছিল হার্ডিঞ্জ সেতুর দিকে। কিন্তু তাদের আরেকটা দলকে কেন ঝিনাইদহ হয়ে খুলনার দিকে যেতে হবে, তা ছিল প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ খুলনা ও চালনা তাদের কৌশলগত লক্ষ্য ছিল না। তাদের প্রধান কৌশলগত লক্ষ্য ছিল ঢাকা। একইভাবে ঢাকাই যদি প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে যে পথে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ঢাকা আসতে পারা গেল, সেখানে অর্থাৎ মেঘালয়ের তুরায় কেন শুধু একটা ব্রিগেড ছিল? কামালপুরের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ ময়মনসিংহের উত্তর দিক থেকে যেটা জেনারেল নাগরার বাহিনী, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ঢাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। কিন্তু প্রথম থেকে সেখানে ছিল শুধু একটা ব্রিগেড। সুতরাং তাদের পরিকল্পনাতেও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছিল। তার পরও ওদের একটা সুচিন্তিত

সামরিক পরিকল্পনা ছিল এবং এই সামরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে তারা সেই পরিকল্পনার পুনর্মূল্যায়ন করত, সংশোধন করত। অন্যদিকে আমাদের বাংলাদেশ বাহিনীর দিক থেকে তেমন কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা ছিল না, ফলে পুনর্মূল্যায়ন বা সংশোধন করার কথাও উঠত না। অধিকন্তু আমাদের সেনা কর্মকর্তারা যতটা দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব তাঁদের দেওয়া হয়েছে। সেক্টর অধিনায়কেরা অতিরিক্ত চাপের মধ্যে থেকেছেন অসংখ্য কাজ চাপিয়ে দেওয়ার ফলে। একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ, দেশের ভেতর মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠানো, যুদ্ধ-পরিকল্পনা প্রণয়ন, তার ভিত্তিতে যুদ্ধ তৎপরতা চালানো, পরিকল্পনামতো সেসব হচ্ছে কি না তা দেখা—সব মিলিয়ে আমাদের অধিনায়কেরা সত্যি অতিরিক্ত বোঝার চাপে ছিলেন। আসলে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁদের কাছ থেকে আমাদের চাওয়াটা এমনই ছিল, যা বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা কখন হয়, যখন কোনো বাহিনীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও কৌশলগত চিন্তাধারা প্রণয়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকে। আমি যেটা দেখি, এটা ছিল আমাদের কেন্দ্রীয় সেনা-নেতৃত্বের ব্যর্থতার বড় একটি দিক। বস্তুত আমাদের সেনাকাঠামোর মধ্যে যিনি আমাদের দেশের অত্যন্ত নন্দিত মানুষ—জেনারেল ওসমানী, তাঁর কোনো জায়গাতেই বাস্তব বা মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা ছিল না। তা ছাড়া তিনি ছিলেন বয়স্ক মানুষ। গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কেও তাঁর কোনো তাত্ত্বিক ও পুথিগত ধারণা ছিল না।

এস আর মীর্জা : আসলে সদর দপ্তরের যুদ্ধ-পরিকল্পনা বলতে তেমন কিছু ছিল না। বরং কর্নেল ওসমানীর ছিল খামখেয়ালিপূর্ণ পদক্ষেপ। মুক্তিযুদ্ধের সময় ওসমানীর খামখেয়ালির শিকার হয় ফরিদপুর এলাকার একদল গেরিলা। একটি উদাহরণ দিই। বিষয়টি আমার আজও মনে আছে। ফরিদপুর এলাকার গেরিলাদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠাতে হবে। গেরিলা যুদ্ধের একটা নিয়ম, যারা যে এলাকার, তাদেরকে সেই এলাকাতেই পাঠানো। ফরিদপুর এলাকার গেরিলাদের ফরিদপুরেই পাঠাতে হবে। কারণ তারা সব ফরিদপুরেরই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পথেই পাঠাতে হবে। অর্থাৎ যশোর সীমান্ত দিয়েই তাদের বাংলাদেশের ফরিদপুরের উদ্দেশে পাঠানোটাই ছিল স্বাভাবিক। তা না পাঠিয়ে, কর্নেল ওসমানীর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন খালেদ মোশাররফ, তাঁর যে সেক্টর এলাকা আগরতলা, সেই আগরতলা দিয়েই ফরিদপুরের গেরিলাদের পাঠানোর জন্য তিনি চাপ দিলেন। মেজর খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে এই কাজটি করতে হবে, সে কথাও তিনি বললেন। সমস্যা যেটা দাঁড়াল সেটা হলো, ওই এলাকা থেকে ফরিদপুরে যেতে হলে তাদের অনেকটা পথ ঘুরে নদীপথে যেতে হবে। গেরিলারা ওসমানীর নির্দেশ মেনে খালেদ মোশাররফের এলাকা থেকে নদীপথে রওনা হয়। তারা যে নদীপথে

রওনা হলো, সেই পথে পাকিস্তানি সৈন্যরা সেদিন টহল দিচ্ছিল। নদীতে এক স্থানে গেরিলাদের পাকিস্তানি সৈন্যরা ঘেরাও করে এবং তাদের গুলিতে গেরিলাদের প্রায় সবাই নিহত হয়।

এখানে প্রাসঙ্গিক না হলেও কর্নেল ওসমানী সম্পর্কে আমার শোনা আরেকটি কথা বলতে চাই। সেটা তাঁর কর্মজীবনের ঘটনা। কর্নেল এম এ রব ১৯৭১ সালে কলকাতায় আমাকে বলেছিলেন ওসমানীর কর্মজীবনের এই ঘটনার কথা। কর্নেল রবকে আমি চিনতাম সেই ১৯৪৮ সাল থেকে। তখন তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। আর আমি ওই সময় পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে যোগদান করি। যা-ই হোক, ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের কথা। কর্নেল রব তখন বাংলাদেশ বাহিনীর চিফ অব স্টাফ। আগরতলায় বসতেন। মাঝেমধ্যে কলকাতায় আসতেন। কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। একবার কলকাতায় এসেছেন কাজে, সেবার বোধহয় দুই-তিন দিন ছিলেন। একদিন ওসমানী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আমার কাছে এসেছেন। এসেই তিনি বললেন আমাকে খাওয়াবেন। পরে আমাকে ও ফ্লাইট লে. রেজাকে তিনি একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন খাওয়াতে। সেদিন তিনি কেন জানি কর্নেল ওসমানীর ওপর কিছুটা ক্ষিপ্ত ছিলেন। খেতে খেতে তিনি বললেন, 'জানো, কাশ্মীর যুদ্ধে ওসমানীকে একটা বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর বাহিনীকে যে এলাকায় পাঠানো হয়, সেই এলাকায় এক উপজাতি গোষ্ঠী বাস করত। তারা ছিল ঘোরতর যুদ্ধবাজ উপজাতি। ওই উপজাতি গোষ্ঠী কী এক কারণে হঠাৎ ওসমানীর সেনা-অবস্থানের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলে আকস্মিক একটা যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে ওসমানী গোপনে সেনাশিবির ছেড়ে চলে যান এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফিরে আসেন। ওই ঘটনার পর পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষ বিষয়টির ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্তে দেখা যায়, সেখানে তখন সুবেদার মেজর ছিলেন কিন্তু ওসমানী ছিলেন না। কমিটির কাছে এতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি হয়তো ভয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছেন। অনুপস্থিতি প্রমাণিত হওয়ার পর ওসমানীকে বাহিনী পরিচালনার নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাঁকে সরবরাহ বিভাগে বদলি করা হয়।' কর্নেল রব আরও বললেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকাকালে ওসমানী আর কখনো বাহিনী পরিচালনার নেতৃত্ব পাননি। মূলত তিনি ছিলেন পাকিস্তান সেনাবহিনীর স্টাফ অফিসার।

আসলে কর্নেল ওসমানীর একটা সমস্যা ছিল, তিনি গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন না। এ সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনাও তেমন ছিল না। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ গেরিলা যুদ্ধ করে যে স্বাধীনতা লাভ করেছে, এটা তিনি বোধহয় পড়েননি। তিনি একমাত্র গতানুগতিক, প্রচলিত বা প্রথাগত যুদ্ধে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সে ব্যাপারেও তিনি ভালো পরিকল্পনা দিতে পারেননি। সেনাবাহিনীতে যাঁরা

স্টাফ অফিসার হন বা থাকেন, তাঁদের পক্ষে পরবর্তী সময়ে নেতৃত্ব দেওয়া দুরূহ একটি কাজ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ওসমানী মূলত কাগুজে জেনারেল ছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয়দের যুদ্ধ-পরিকল্পনা ছিল সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত। তাদের এই পরিকল্পনাকে সমরবিশেষজ্ঞরা বলেছেন, তখন পর্যন্ত এটা ছিল বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ও সুপরিকল্পিত যুদ্ধ এবং সেই সমরাভিযান পরিচালনা করার জন্য তারা নিজ দেশ, বিশ্বজনমত, অন্য আনুষঙ্গিক তৎপরতা তাদের অনুকূলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

এ কে খন্দকার : ভারতীয়দের দিক থেকে তো যুদ্ধ-পরিকল্পনা একটা নিশ্চয়ই ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তচৌকি ও ঘাঁটিগুলোকে তারা ধ্বংস করা শুরু করল একপর্যায়ে। ফলে পাকিস্তানিরা সীমান্তে জড়ো হতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে আমাদের গেরিলারা ব্যাপক সংখ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।

ভারতীয়দের আরও একটা সুবিধা ছিল। তাদের জানাও ছিল ঢাকায় পাকিস্তানিদের একটিমাত্র বিমান স্কোয়াড্রন আছে। বিমানশক্তি ছাড়া এখন যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, সে যে যত বড় জেনারেলই হোন না কেন। বিমানশক্তি হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ সামরিক শক্তি। ফিল্ডগান বা ট্যাংক আছে। কিন্তু এর ভ্রাম্যমাণ শক্তি খুব অল্প, যেমন কাদা থাকলে বা নদী থাকলে ফিল্ডগান বা ট্যাংক চলতে পারবে না। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ সামরিক শক্তি যদি বলতে হয়, তাহলে বিমানশক্তিকেই বলতে হবে। এই শক্তি যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময় যেতে পারবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে। ডিসেম্বরে যখন ঢাকার বিমান অবতরণ-উড্ডয়নক্ষেত্র দুই দিনের মধ্যে একদম অকেজো হয়ে গেল, তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধ করার মতো সত্যি আর কিছু ছিল না। বিমানশক্তি বা বিমানের সাহায্য না হলে যুদ্ধ করা যায় না। এই সুযোগ পুরোপুরি ভারতীয় বাহিনী ব্যবহার করেছিল। সুতরাং দুটি কারণ, একটি হচ্ছে যে তাদের একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত পকিল্পনা ছিল, খুবই স্বাভাবিক যে ভারতীয় বাহিনী একটা সুসংগঠিত সামরিক বাহিনী ছিল। তাদের পরিকল্পনার মধ্যে সত্যি কথা বলতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীও ধরা দিয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শেষ পর্যন্ত একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানের কোনো একটি এলাকায় একটি মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করবে। অর্থাৎ ভারতীয়রা মুক্তিবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও না কোথাও একটা মুক্ত জায়গা করে সেখানে বাংলাদেশের রাজধানী করে পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, যে ধারণার বশবর্তী হয়ে পাকিস্তানিরা সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, যাতে করে মুক্তিযোদ্ধারা বা ভারতীয়রা মুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে না পারে। আমরাও প্রথম দিকে এমন একটা ধারণা পোষণ করলেও পরবর্তী সময়ে এ ধারণা বাতিল করা হয়েছিল। ভারতীয় পরিকল্পনার

এই জায়গাটায় পাকিস্তানিরা ধরা দিয়েছিল। তারপর যখন টাঙ্গাইল হয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভারতীয় বাহিনী ঢাকার কাছাকাছি চলে এল, তখন ৯ বা ১০ ডিসেম্বর থেকে যে আলোচনা শুরু হলো, ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এর সফল সমাপ্তি হয়। সুতরাং যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে আমাদের পরিকল্পনা ছিল কি না—পরিকল্পনা ছিল এবং সেটা হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ। এই পরিকল্পনাটা যদি আমরা বরাবর চালিয়ে যেতাম, তাহলে আমরা আরও বেশি সফলতা লাভ করতে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস।

যৌথ সামরিক নেতৃত্ব

মঈদুল হাসান : আমরা এখন যৌথ কমান্ড সম্পর্কে আলোচনা করব। এ ব্যাপারে আপনার (এ কে খন্দকার) অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

এ কে খন্দকার : আমরা ভারতে থেকে যুদ্ধ করছি, যুদ্ধ তৎপরতা চালাচ্ছি, ভারতের সাহায্য নিয়ে, তাদের গোলাবারুদ নিয়ে এবং সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাহায্য নিয়ে। তাই সামগ্রিক যুদ্ধ তৎপরতাগত পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে একটি সমন্বয়ের জরুরি প্রয়োজন ছিল। প্রথমে এই সমন্বয়ের কাজটি হয়নি। যুদ্ধের প্রথম দিকে এ ব্যাপারে ভারতের দিক থেকে ওপরের নির্দেশের অপেক্ষায় কিছুটা অনীহা ছিল। আমাদের দিক থেকে কর্নেল ওসমানীর এ ব্যাপারে কোনো ধরনের উৎসাহ ছিল না। আর সেক্টর পর্যায়ে এই সমন্বয়ের কাজটি হয়ে ওঠেনি। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে এই বিভেদ ও দূরত্ব ছিল অক্টোবর মাস পর্যন্ত। অক্টোবর মাস থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিভিন্ন সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ বা গেরিলা তৎপরতায় গোলন্দাজ বাহিনীর ছত্রছায়া দিতে শুরু করে। আমাদের দিক থেকে কোনো যুদ্ধ তৎপরতায় যাওয়ার সময় বা তার আগে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী কামানের গোলা ছুড়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলত বা এলোমেলো করে দিত। তারপর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা গিয়ে সেই যুদ্ধ তৎপরতা পরিচালনা করত বা লক্ষ্য পূরণ করত। পরে যখন ক্রমাগত অবনতিশীল পরিস্থিতির মুখে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন ভারতীয় পক্ষ থেকে এই সমন্বয়ের বিষয়টি আসে। একটা যৌথ সামরিক নেতৃত্ব গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এটা প্রয়োজন এই জন্য যে একদিকে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করবে, অন্যদিকে ভারতীয় বাহিনীও যুদ্ধ করবে। এর মধ্যে সমন্বয় না থাকলে অনেক সময় আত্মঘাতী ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর এতে করে ভুল-বোঝাবুঝি হবে।

যৌথ সামরিক নেতৃত্ব গঠনের বিষয়টি প্রথমেই ওঠে রাজনৈতিক পর্যায়ে, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের কাছে। তিনি এই বিষয়টির দায়িত্ব দেন কর্নেল ওসমানীকে। তিনি এই যৌথ নেতৃত্ব গঠনের ব্যাপারটির ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন। ওসমানী ভারত-বাংলাদেশ একটি যৌথ সামরিক নেতৃত্ব হোক এটা চাননি। তাঁর মনোভাব ছিল, আমাদের সামরিক তৎপরতা আমরা করব, মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর যৌথ সামরিক নেতৃত্ব হবে না। শেষে যুদ্ধ পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে রাজনৈতিক পর্যায়ে এই যৌথ সামরিক নেতৃত্ব গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সময় কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ করেন। এর আগে তিনি কয়েকবার পদত্যাগ করেছেন মৌখিকভাবে। যুদ্ধের এই চূড়ান্ত ও সংকটজনক পর্যায়ে মৌখিকভাবে পদত্যাগের কথা বলার পর ওসমানী সাহেবকে তাজউদ্দীন আহমদ লিখিতভাবে পদত্যাগ করতে বলেন। তখন তিনি আর লিখিত পদত্যাগপত্র দেননি। এর পর থেকে বলা যায় তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতেন এবং কোনো বিষয়ে কোনো উৎসাহ দেখাতেন না। ফলে তাজউদ্দীন সাহেব আমাকেই ডেকে পাঠাতেন। এ ব্যাপারে আমাকে একবার দিল্লিও যেতে হয়েছিল। ডি পি ধর আমাকে বললেন, 'আপনাকে দিল্লি যেতে হবে।' কর্নেল ওসমানীর এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ না দেখে আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞেস করি। প্রধানমন্ত্রী আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং করণীয় সম্পন্ন করার কথা বলেন। এরপর আমি দিল্লি যাই। দিল্লিতে ভারতীয় সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁদের সঙ্গে এই আলাপ থেকে আমি বুঝতে পারি যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন।

ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে আমার এর আগে কথা হয়েছিল নৌবাহিনীর ব্যাপারে। বিশেষত বড় বড় বন্দরসহ বিস্তৃত অঞ্চলের নদীবন্দরে কাজ করতে হবে—এটা নিয়ে আলোচনা হয়। আমি নৌবাহিনীর ব্যাপারে কথা বলি ক্যাপ্টেন সামন্ত সিংয়ের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর ছিল। তিনি প্রথম দিকে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেও পরের দিকে আর করেননি। আমার সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ হতো। এমনকি ১৫ আগস্ট তারিখে নৌ-কমান্ডোরা যে তৎপরতা চালায়, সেটা যাচাই করতে বা সে বিষয়ে খোঁজখবর নিতে আমি আর ক্যাপ্টেন সামন্ত আগরতলা গিয়েছিলাম। এর পর থেকে বাংলাদেশের নদীপথে বিভিন্ন গেরিলা ও যুদ্ধ তৎপরতা নিয়ে ক্যাপ্টেন সামন্তের সঙ্গে আমার আলোচনা হতো।

ওই সময় আলোচনা হয়, যদি বিমানবাহিনী যুদ্ধে নামে, তাহলে আমরা কী লক্ষ্যবস্তু ঠিক করব। এর আগেও এ নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। কলকাতায় বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আমার প্রথম আলাপ হয় এয়ার মার্শাল লালের সঙ্গে। আলোচনার পর তিনি আমাকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন। পরে তাঁর কাছে আমি গিয়েছিলাম। সে সময় তাঁর স্ত্রীও উপস্থিত

ছিলেন। মার্শাল লালের স্ত্রী ছিলেন বাঙালি। সেখানে আলোচনা হয় আমরা কোন লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করতে পারি। আমরা দুজন একমত হই যে আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে কোনো বড় লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে বড় বড় রাস্তা, স্থাপনা, রেলপথ আক্রমণ করতে পারব না। কিন্তু যদি তেলের ডিপোর মতো স্থাপনা ধ্বংস করতে পারি, সেটা হবে বড় অর্জন। এটা পাকিস্তানিদের জন্য মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করবে। পরে নভেম্বর মাসে দিল্লিতে পুনরায় তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়। তখন বিমানবাহিনীর আক্রমণ পরিকল্পনায় এই কৌশল বহাল থাকে। সুতরাং বিমান ও নৌবাহিনী ছিল সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল, উচ্চমানের প্রশিক্ষণসমৃদ্ধ এবং তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল স্বল্প ও স্থির। এ জন্য আক্রমণ পরিকল্পনায় এই দুই বাহিনী সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিল। বিমানবাহিনীর আক্রমণ পরিকল্পনা ডিমাপুরে যৌথভাবে করা হয়। কোথা থেকে কোথায় উড্ডয়ন করবে, কোন কোন লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করবে ইত্যাদি।

বিস্তৃত ও চূড়ান্ত পরিকল্পনায় তেল ডিপোকে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়েছিল। নৌবাহিনীর ক্ষেত্রেও তা-ই। প্রশিক্ষণের সময়ই বলা হয়েছিল, কোথায় কোথায় আক্রমণ করা হবে। চট্টগ্রাম বন্দর আক্রমণ করার কথা ছিল। তবে একটা লক্ষ্যবস্তু পরিকল্পনা করার পর চূড়ান্ত পর্যায়ে বাস্তব কারণে এটা বাতিল হতে পারে। নৌ-কমান্ডোদের আক্রমণ করার কথা ছিল ১৪ আগস্ট। কারণ পাকিস্তানিরা স্বাধীনতা দিবস নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আবার তারা স্বাধীনতা দিবসে সজাগও থাকবে, এ জন্য আক্রমণ পিছিয়ে ১৫ আগস্টে করা হয় ওদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। এখন যারা আগরতলা বা চট্টগ্রামে গিয়ে পৌঁছেছে, তারা কী করে আক্রমণের সময় জানবে? এ জন্য একটা কৌশলী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার ও আকাশবাণীতে বিভিন্ন সময় পূর্বনির্ধারিত গান প্রচার করে তার মাধ্যমে এই সময় এবং তাদের কী করতে হবে, তা জানানো হয়েছিল। ওই গানই ছিল সংকেত যে তাদের কখন কী করতে হবে। সামান্য অস্ত্রপাতি নিয়ে নৌ ও বিমানবাহিনীতে বিরাট সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল। এর প্রধান কারণ হলো, এই দুই বাহিনী ছিল খুবই সুশৃঙ্খল। পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত চমৎকার এবং লক্ষ্যবস্তু ছিল স্থির।

মঈদুল হাসান: অক্টোবরে ভারত যখন সীমান্তযুদ্ধ শুরু করে তখন অন্যান্য বিষয় সামনে চলে আসে। ভারত যে সীমান্তযুদ্ধ শুরু করেছে, এটা যদি পাকিস্তান মোকাবিলা করতে চায়, তাহলে বিষয়টি একটি পাক-ভারত যুদ্ধের দিকে যাবে। পাকিস্তানের হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর ভারতে যখন শরণার্থীর স্রোত দ্রুত বেড়ে চলে, তখন থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনী একটি যুদ্ধের পরিকল্পনা শুরু করে দেয়। সব দেশের সেনাবাহিনীই আসন্ন ও কল্পিত বিপদ মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন ধরনের

প্রতিরক্ষা-কৌশল নির্ধারণ করে থাকে। উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী এ কাজটি শুরু করে দিয়েছিল মে মাস থেকেই। ভারতের যুদ্ধ পরিকল্পনা যে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে আমরা কিছু আভাস পেলেও বিস্তারিত জানতাম না।

ক্রমশ তারা এই সিদ্ধান্তে আসে যে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্ত করেই শুধু তাদের দেশে অবস্থান নেওয়া বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে ওখানে ফেরত পাঠানো সম্ভব। আমি এবং আমাদের কিছুসংখ্যক মানুষ—আমরা মনে করতাম যে আমাদের গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশন দ্রুত বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি সেক্টর পর্যায়ে যুদ্ধ পুনরায় শুরু করা একান্ত প্রয়োজন। সেক্টর পর্যায়ে যুদ্ধ শুরু করার জন্যই জুলাই মাসে কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সেক্টর অধিনায়কদের সভায়। এটা কার্যকর করার জন্য আগস্ট মাস থেকে তার্দের জন্য অস্ত্র বরাদ্দ বাড়তে থাকে। কিন্তু দেখা গেল, কোনো সেক্টরই ততটা কাজ করছে না। তাদের কাজ না করার কারণগুলো এ কে খন্দকার বলেছেন। শুধু গেরিলারা কাজ করছে। কিন্তু ভালো কোনো খবর না পাওয়ায় এবং এই খবর পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বাইরে থেকে আমরা গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাজের প্রভাবটা বুঝতে পারছিলাম না কত বড় বা কোন পর্যায়ে কাজ হচ্ছে। কারণ এটা তো আর বোতাম টেপার মতো কোনো ব্যাপার নয় যে কোথাও ১০ হাজার লোক পাঠালে পরদিন থেকে এই ১০ হাজার লোক ওখানে কাজ শুরু করবে। এর জন্য সময়ের দরকার। এই গেরিলা যোদ্ধাদের কেউ অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে, কেউ পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ ধরা পড়েছে, আবার কেউ কাজ করছে। আর যারা কাজ করছে তাদের কৌশল ও দক্ষতা আস্তে আস্তে বাড়ছে। তাদের ভারত থেকে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো শুরু হয়েছে জুনের শেষ সপ্তাহ এবং জুলাই থেকে। তাদের যুদ্ধ ও কৌশলে একটা দক্ষতা আসতে প্রায় দুই-তিন মাস লেগেছে। সে জন্য অক্টোবর মাসের আগে এর পুরো প্রতিক্রিয়া আমরা বুঝতে পারিনি।

আগস্টের পর ভারতের পক্ষ থেকে আরও কিছু অস্ত্র ও রসদ দিয়ে সেক্টর বাহিনীকে সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে কিছু লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে দেওয়া হয়; যেখানে পাকিস্তানিদের শক্ত ঘাঁটি, বাংকার, কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা পাকিস্তানিদের যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদি আছে, সেগুলো ধ্বংস করতে বলা হয়। এই মাসিক লক্ষ্যবস্তু ঠিক করার কাজটা শুরু হয় মেজর জেনারেল বি এন সরকারের ফোর্ট উইলিয়ামের কার্যালয় থেকে। আমার মনে আছে, মাসিক লক্ষ্যবস্তু পরিকল্পনার প্রথম সভাটি হয় সেখানেই। জেনারেল বি এন সরকার এই সভায় ডেকেছিলেন এ কে খন্দকার সাহেব, মেজর এম এ মঞ্জুর ও আমাকে। আলোচনার পর দেখা গেল, আমাদের নিজেদের মধ্যেই বিষয়টির সামগ্রিক দিক পরিষ্কার নয়। জেনারেল সরকার যে প্রশ্নটি তোলেন, আমার মনে হয় খন্দকার সাহেবও এটা মনে করতে

পারেন। তা ছিল এই যে ছোটখাটো আক্রমণ তৎপরতাগুলো করা হচ্ছে— একটা লাইন উড়িয়ে দেওয়া, একটা বিদ্যুতের খুঁটি নষ্ট করে দেওয়া, একটা বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া—এগুলো পাকিস্তানি বাহিনী এক দিনের মধ্যে মেরামত করে ফেলছে। কাজের মধ্যে যেটা হচ্ছে, গেরিলারা যেখানে আক্রমণ ও তৎপরতা চালাচ্ছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেখানে গিয়ে আশপাশের দু-দশটা গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। ফলে ওই এলাকার শত শত মানুষ শরণার্থী হিসেবে বাড়িঘর ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। শরণার্থী আগমনের সামগ্রিক চিত্রটি পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায় যে আগস্ট-সেপ্টেম্বর—এই দুই মাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় শরণার্থী এসেছে। তাই জেনারেল বি এন সরকার প্রশ্ন তুললেন যে এই আক্রমণ বা তৎপরতা আরও বাড়িয়ে পাকিস্তানিদের আরও বিপর্যস্ত করা যায় কি না। তাঁর বোধহয় আরও কিছু পরিকল্পনা ছিল। এই পরিকল্পনা ছিল—আমি যেভাবে বুঝেছি, খন্দকার সাহেবও মনে করতে পারেন, বাংলাদেশে যেসব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও পাটকল ছিল, তখন পাকিস্তান সরকার কিন্তু কিছু পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি শুরু করছে, এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও পাটকলগুলো আক্রমণ করা। গেরিলারা গিয়ে বোমা মেরে এগুলো অকেজো করে দেবে। আমার যে রকম অসামরিক বুদ্ধি, আমি সেখানে বলে বসলাম—ভিয়েতনামে এত বড় যুদ্ধ চলছে, সেখানে ভিয়েতকং বাহিনী তাদের তৎপরতায় কোনো শিল্প-কারখানা আক্রমণ করে নষ্ট করছে না। তাদের যুক্তি হলো—দেশ যখন স্বাধীন হবে, তখন এসব শিল্প-কারখানা তো আমাদেরই হবে। মেজর এম এ মঞ্জুর এর ভীষণভাবে বিরোধিতা করে বললেন, এগুলো অত্যন্ত অসামরিক কথা। এগুলো আঘাত করে অকেজো করতেই হবে। আমিও এর বিপক্ষে শক্ত যুক্তি দিলাম। পরদিন ৮ থিয়েটার রোডে আমার কানে এল যে বাংলাদেশ বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর সামরিক কর্মকাণ্ডে অসামরিক হস্তক্ষেপ বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও মেজর জেনারেল বি এন সরকারকে জানাই যে আমার বোধহয় এ রকম সভায় আর উপস্থিত থাকা ঠিক নয়। বিষয়টায় কিছুটা স্পর্শকাতরতা আছে। এসব বিষয়ে আমরা আলাদাভাবে নিজেরা আলাপ করব।

এ কে খন্দকার : ওই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। মঈদুল হাসান সাহেব বলায় বিষয়টি আমার এখন মনে পড়ছে। এ রকম আপত্তি মেজর এম এ মঞ্জুর করেছিলেন। আমি আগেও বলেছি, যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো অর্থনৈতিক কেন্দ্র বা কোনো কৌশলগত স্থাপনা বা যোগাযোগ কেন্দ্র—যেমন হার্ডিঞ্জ সেতু, ভৈরব সেতু, আদমজী পাটকল—আক্রমণ করতে হলে রাজনৈতিক ছাড়পত্র বা অনুমতি নিতে হয়। বিষয়টি আমি সভায় উল্লেখ করছিলাম। যেসব স্থাপনার অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে, সেখানে আক্রমণ করার জন্য রাজনৈতিক একটা অনুমোদন থাকা

প্রয়োজন। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত পাটকলে আর আক্রমণ করা হয়নি। এমন কিছু জায়গা লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, যেখানে গেরিলা বা মুক্তিযোদ্ধাদের যাওয়ার মতো সামর্থ্য আছে।

মঈদুল হাসান : সেপ্টেম্বর থেকে সেক্টর বাহিনীর লক্ষ্যবস্তু নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। আর প্রস্তাব হলো, সেক্টরের জন্য লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে দেওয়া হবে। লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে এগুলো প্রথমে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরে পাঠানো হবে। এগুলো মেজর জেনারেল বি এন সরকারের কার্যালয়ে বসে ঠিক করা হতো। এর একটা অনুলিপি যেত বাংলাদেশের সেক্টর অধিনায়কদের কাছে, আরেকটি যেত ভারতীয় বাহিনীর ফরমেশন অধিনায়কদের কাছে। আমাদের সেক্টর ঘাঁটির কাছেই ভারতের ফরমেশন ঘাঁটি ছিল। এসব ফরমেশন ঘাঁটিতে সেনাসংখ্যা ব্যাটালিয়নের ওপরে রাখা হয়েছিল। পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল ব্রিগেড।

আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর ছাড়াও সেক্টর অধিনায়ক ও ভারতের ফরমেশন অধিনায়কদের কাছে মাসিক লক্ষ্যবস্তু যেত, যাতে কৌশলগত পরিকল্পনাগুলো মাঠপর্যায়ে ভারতের ফরমেশন অধিনায়ক ও আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে পারেন। আমাদের সেক্টর যদি মনে করত যে সদর দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন, তারও সুযোগ ছিল। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি যে মাঠপর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে সমস্যাও ছিল। আমার মনে হতো, সমস্যাগুলো আসলেই ছিল। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কামালপুরে পাকিস্তানিদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। তারা সেখানে সুরক্ষিত বাংকার ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করে তার ভেতরে অবস্থান নিয়েছিল। ওখানে তিনবার আক্রমণ করা হয় এবং তিনবারই আমাদের বিপুল ক্ষতি হয়। ভারতীয়রা মনে করত, ভবিষ্যতে তাদের বাহিনী ওই পথেই যাবে। তাই ওই পথটাকে পরিষ্কার করা ও নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ওখানে কাজে লাগানো হতো। প্রথমে মেজর জিয়াউদ্দিনের বাহিনী কামালপুর আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বার তারা সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন ভারতীয় বাহিনী এক ব্যাটালিয়নের চেয়ে বেশিসংখ্যক সৈন্য নিয়ে সেখানে আক্রমণ করে। কিন্তু তারাও সেখানে ভীষণ ক্ষতির মুখে পড়ে। তাদের অনেক সেনা নিহত হয়। তৃতীয়বারে ভারতীয় বাহিনী ব্রিগেডের চেয়েও বেশিসংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

আবার কিছু জায়গায় সেক্টর বাহিনী বা গেরিলাদের বলা হতো, অমুক জায়গায় একটা সেতু আছে, ওটা ধ্বংস করে এসো। যে পথটা দিয়ে যেতে বলা হতো, হয়তো দেখা গেল, সেই পথে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে হলে সাত-আট মাইল ঘুরে যেতে হবে। আমি সেপ্টেম্বর মাসের কথা বলছি। তখনো বর্ষা চলছে, বৃষ্টি হচ্ছে,

পথঘাটে কাদা, রাতের বেলা তাদের হেঁটে যেতে হতো। সাধারণত তারা এতটা পথ ঘুরে যেতে চাইত না। তাই তারা নিজেরা লক্ষ্যবস্তু পরিবর্তন করে কাছাকাছি একটা জায়গায় লক্ষ্যবস্তু ঠিক করত। ভারতীয়রা চাইত না বাংলাদেশ লক্ষ্যবস্তু পরিবর্তন করুক। তারা জানত যে পাকিস্তানিরা তাদের আর্টিলারি দিয়েই ভারতীয় ভূখণ্ডের ওপর এর পাল্টা জবাব দেবে। মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের মতো করে যেখানে যেত, সেটার কাছেই হয়তো ভারতের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। সেখানে পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতীয় বাহিনী আর্টিলারি কভার দিত না। এতে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক হতাহত হতো। তখন আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা বলতেন, আমরা তো ভারতীয় বাহিনীকে বলেছি, অমুক জায়গায় যেতে পারব না। কারণ আমরা সেখান থেকে সকাল হওয়ার আগে ফিরতে পারব না। আমরা ভারতীয় বাহিনীর ফরমেশনকে ২৪ ঘণ্টা আগেই এ কথা তো বলেছি। তারা আমাদেরকে আর্টিলারি কভার দেয়নি।

এদিকে এক দিনের মধ্যে হয়তো ভারতের গোলন্দাজ বাহিনীকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। অথবা তারা গোলন্দাজ বাহিনীকে মোতায়েন করত না তাদের দিকের ঘনবসতির জন্য। এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারত বড়। ভারতীয় এলাকার সাধারণ লোকেরা যদি পাকিস্তানি গোলন্দাজদের কামানের গোলা খেত, তাহলে হয়তো বলত যথেষ্ট হয়েছে বাংলাদেশের জন্য। কেননা ভারতীয় সাধারণ মানুষ তত দিনে আমাদের রাজনীতিকদের স্বভাব, চরিত্র, আমাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা, আমাদের লুটের টাকা ইত্যাদি দেখে এমনিতেই বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। জুন মাসের দিকে যখন কলকাতায় চোখ উঠল ব্যাপকভাবে, এটা শরণার্থী শিবির থেকে হয়েছিল, তখন এর নাম মুখে মুখে হয়ে গেল 'জয় বাংলা'। আমাদের কর্মকাণ্ড দেখে ওখানকার মানুষের সহানুভূতি ও সহ্যসীমা তত দিনে যথেষ্ট নিচে নেমে গেছে।

এই স্পর্শকাতর ও জটিল সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ব ছিল আমাদের সদর দপ্তরের। সদর দপ্তরের সেই দায়িত্ব পালন করতে হলে তার সেই রকম লোকবল থাকতে হতো। কিন্তু সদর দপ্তরের লোকবল বলতে ছিল মাত্র চার-পাঁচজন কর্মকর্তা। এ কে খন্দকার সাহেব, তিনি সামরিক বা গেরিলা তৎপরতা পরিচালনার ব্যাপারে এবং গেরিলাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। সামরিক ও গেরিলা তৎপরতা পরিচালনার সুবিধার্থে অন্তত তিনটি আঞ্চলিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হতো সেক্টর নেতৃত্বগুলোকে তদারক করার জন্য। একটি পশ্চিমে, একটি উত্তর-পূর্ব দিকে ময়মনসিংহ অঞ্চল নিয়ে এবং অন্যটি পূর্বে আগরতলায়। এতে মাঠপর্যায়ের সমস্যার হয়তো অনেকখানি সুরাহা হতো।

যা-ই হোক, সেপ্টেম্বরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে এসে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে থেকে ভারতীয় বাহিনীর ওপর থেকে তাদের

সীমান্ত তৎপরতার ব্যাপারে বাধানিষেধ অনেকটা তুলে দেন। এর আগে সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সেনাদের চলাচল নিয়ন্ত্রিত ছিল। তারা যাতে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম না করে, এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইন্দিরা গান্ধী তখন সেনাবাহিনীকে সুস্পষ্টভাবে বলে দেন, যদি ঘটনার চাপে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়, তাহলে তা তারা করতে পারবে।

তাঁর ওই নির্দেশের পর অক্টোবর মাসের ১২ তারিখ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজেরাই যুদ্ধে নেমে পড়ে। আমাদের সেক্টর বাহিনীকে যে দায়িত্ব দেওয়া হতো, তারা অনেক ক্ষেত্রেই পালন করতে পারত না। ফলে তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সেই দায়িত্ব পালনেরও নির্দেশ দেওয়া হলো। কাজেই দুটি পাশাপাশি সামরিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। একটি ভারতের ফরমেশন নেতৃত্ব এবং অন্যটি আমাদের সেক্টর নেতৃত্ব। কিন্তু যুদ্ধ ছিল একটাই। একই থিয়েটারে দুটি আলাদা নেতৃত্ব থাকলে অনেক অসুবিধা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে পৃথিবীর সব যুদ্ধেই যৌথ সামরিক নেতৃত্ব একই ব্যবস্থায় চলে এসেছে আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে। সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা যৌথ নেতৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব পান। যৌথ সামরিক নেতৃত্ব গঠন করার পর দেখা গেল ভারতীয় ফরমেশন অধিনায়কেরা আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের চেয়ে অনেক জ্যেষ্ঠ। তাঁরা কেউ ব্রিগেডিয়ার বা জেনারেলের নিচে নন বা সিনিয়র কর্নেলের নিচে নন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সব পর্যায়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব ভারতীয় সামরিক অধিনায়কেরা পেলেন। এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে একটু উষ্মা সৃষ্টি হয়েছিল।

অক্টোবরে মেজর জেনারেল বি এন সরকার এসে বললেন, একটা সমস্যা হচ্ছে। ফরমেশন ও সেক্টর নেতৃত্বের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য বেতার বা ওয়্যারলেস সংযোগ ছিল, যাতে করে তারা সর্বদাই কথা বলতে পারেন। বি এন সরকার বললেন, 'আমরা দু-একটা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সেক্টর অধিনায়কদের পাচ্ছি না।' আমি যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য নিয়োজিত ছিলাম, তাই জানতে চাইলাম, কোন বিশেষ জায়গায় সেক্টর অধিনায়কদের পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বি এন সরকার বললেন যে তুরাতে সমস্যা হচ্ছে। তুরাতে তখন ব্রিগেড অধিনায়ক জিয়াউর রহমান। ভারতের দিকে ছিলেন মেজর জেনারেল গুর বক্স সিং গিল। মেজর জেনারেল গিল জরুরিভাবে একটি বিষয়ে জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছিলেন। কিন্তু জিয়াউর রহমানকে পাওয়া যায়নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, একজন বাহককে দিয়ে কি সেই বার্তা পাঠানো যেত না? সরকার বললেন, 'একজন বাহককে দিয়ে বার্তা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সেই বার্তা নেওয়ার মতো দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউকে সেখানে পাওয়া যায়নি।'

তারপর জেনারেল সরকার বিষয়টি পরিষ্কার করেই বললেন। পরে আমাদের লোক দিয়ে আমরা খবর নিয়ে জেনেছি জিয়াউর রহমান ভেতরেই রয়েছেন; কিন্তু ভারতীয় ফরমেশন নেতৃত্ব থেকে কোনো বার্তা তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর কথাটা বললাম এ জন্য যে এ ঘটনাটা আমি নিজে জানি। আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে এটি হয়েছে। এখানে আরও একটা কথা বলি, অনেকেরই জানা, যৌথ নেতৃত্ব গঠন করার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি করেছিলেন আমাদের বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী। তিনি বলেছিলেন, 'এটা কখনোই হতে পারে না। আমরা করব না।'

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তখন বললেন, 'যৌথ নেতৃত্ব ছাড়া আমাদের যুদ্ধ তো আটকে গেছে। বাংলাদেশের সীমান্তে পাকিস্তানি বাহিনীকে যদি নড়বড়ে করে ফেলা না যায়, তাহলে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভেতরে পাঠানোর ঝুঁকি ভারত নেবে না। এটা যুদ্ধ-পরিকল্পনার অন্তর্গত। কাজেই রণক্ষেত্রে সামরিক নেতৃত্বের পূর্ণ সমন্বয় করা অপরিহার্য।'

ওসমানী বললেন, যদি এটা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন। তখন তাজউদ্দীন আহমদ কিছুটা শক্ত অবস্থান নিয়ে বললেন, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি চান যে যৌথ সামরিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক। এর পরও ওসমানী বললেন, তিনি তাহলে পদত্যাগ করবেন। তখন তাজউদ্দীন বললেন, তিনি যেন লিখিতভাবে এই পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। তাজউদ্দীন শক্ত করেই তাঁকে বললেন, তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন। কিন্তু ওসমানী সাহেব শেষ পর্যন্ত সেই পদত্যাগপত্র আর লিখিতভাবে দেননি।

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে যৌথ সামরিক নেতৃত্বের তাত্ত্বিক একটা কাঠামো দাঁড়ায়। বাস্তবে এই সময় আমাদের এক হ-য-ব-র-ল অবস্থা। ইতিমধ্যে আমরা তিনটি ব্রিগেড গঠন করেছি। ওসমানী সাহেব এই তিনটি ব্রিগেড গঠন এবং তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, আবার তিনিই তাঁর অক্টোবরে লেখা 'সামরিক পরিকল্পনায়' ব্রিগেডগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করে সিলেটের চা-বাগানে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন গেরিলা যুদ্ধ চালানোর জন্য। ফলে আমাদের দিক থেকেও বিভ্রান্তি কম ছিল না।

অক্টোবরে ইন্দিরা গান্ধী নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর নভেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্তযুদ্ধে নেমে পড়ে। কামালপুর যুদ্ধে তারা বিশাল ক্ষতি স্বীকার করে। চৌগাছায় যুদ্ধ করে। জাকিগঞ্জ সীমান্তে বেশ কটি জায়গায় যুদ্ধ করে। একমাত্র সালদা নদী অঞ্চলের যুদ্ধ সম্পর্কে মেজর জেনারেল বি এন সরকার বেশ গর্বের সঙ্গে আমাদের ক্যাপ্টেন গাফফারের প্রশংসা করতেন। তিনি বলতেন, এখানে একটা কাজ হচ্ছে। এগুলো শুনতে ভালো লাগত। সঠিক অধিনায়কত্ব

পেলে আমাদের যোদ্ধারা, বিশেষত নন-কমিশন অফিসাররা আরও অনেক ভালো করতে পারতেন। তাঁদের প্রশিক্ষণ ভালো, কৌশল ভালো, ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ভালো। অসাধারণ ছিল তাঁদের তৎপরতা ও কাজকর্ম। এ সত্ত্বেও দেখা গেল, আমাদের সেক্টর বাহিনী সীমান্ত অঞ্চলে অভিযানে খুব একটা এগোয়নি। কেননা নভেম্বর মাসেও আমরা অধিকাংশ জায়গায় এগুলো শুরু করিনি। এ সময়ে সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য জড়ো করা হচ্ছিল। অন্যদিকে দেশের ভেতরে সে সময় আমাদের গেরিলা যোদ্ধারা সত্যিকার অর্থে পাকিস্তানি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে পাকিস্তানি বাহিনী তখনই অপারগ হয়ে পড়েছিল।

এ কে খন্দকার : এটা ছিল আমাদের যুদ্ধ। বাংলাদেশের যদি একা সামর্থ্য থাকত, তাহলে তো যুদ্ধটা করতে ভারতের প্রয়োজনই ছিল না। আমাদের একার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলেই প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি বিষয়ে ভারতীয়দের সহযোগিতা আমাদের অপরিহার্য ছিল। এমনকি সামগ্রিক পরিকল্পনা আমাদের প্রথম থেকেই করা উচিত ছিল যুগ্মভাবে; কিন্তু সেটা করা হয়নি। যৌথ সামরিক নেতৃত্ব, যেটা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ করলেন, যদি না করা হতো, তাহলে ভারতীয় বাহিনী এককভাবেই সব কৃতিত্ব নিতে পারত। আত্মসমর্পণের যে দলিল, সেই দলিলে কেবল ভারতীয়দের কথাই থাকত। এটা ভারতীয়দের বিজয় হিসেবেই ইতিহাসে চিহ্নিত হতো। আমি জানি, ৩ ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয়দের পাশাপাশি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাও একই সঙ্গে এগিয়ে গেছে। আমাদের গেরিলা, সেক্টর বাহিনী, ব্রিগেডগুলো সমান তালেই যুদ্ধ করে দক্ষতা আর সাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছে। বাংলাদেশও এই যুদ্ধের সমান অংশীদার।

কিন্তু যৌথ সামরিক নেতৃত্ব-সংক্রান্ত লিখিত চুক্তি যদি না হতো, তাহলে আমরা যে এই যুদ্ধজয়ের অংশীদার, দাবিদার—এ কথা প্রমাণ করতে পারতাম না, বলতেও পারতাম না। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যৌথ সামরিক নেতৃত্ব বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'কর্নেল ওসমানী এটা চাইছেন না, আপনি কী বলেন?' আমি পরিষ্কারভাবেই তাঁকে বলেছিলাম যে এটা বাস্তবসম্মত এবং করা উচিত। তাজউদ্দীন আহমদও বললেন, 'আমিও মন স্থির করে ফেলেছি, আমি এটা করব।' যৌথ নেতৃত্ব হলেই যে একজনকে আরেকজনের সহায়তা নিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও যৌথ সামরিক নেতৃত্ব হয়েছিল, যেখানে অন্য সব বাহিনীই ছিল মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বের আওতায়। সুতরাং এটা কোনো লজ্জার বিষয় নয়। এটা প্রয়োজনের তাগিদে, আমাদের স্বাধীনতার স্বার্থে করতে হয়েছিল। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে ধন্যবাদ জানাই। বস্তুত তাঁর দৃঢ় অবস্থানের

কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। যৌথ সামরিক নেতৃত্ব হওয়ার ফলেই কিন্তু যেসব সংশয়, শুধু সংশয়ই নয়, অনেক জায়গায় ব্যক্তিগত যে সমস্যা, সেটারও অবসান হয় এই যৌথ নেতৃত্ব হওয়ার ফলে।

যৌথ সামরিক নেতৃত্ব বলতে কিন্তু যৌথ সামরিক পরিকল্পনা, যৌথ সামরিক তৎপরতা বোঝায়, যেটা যুদ্ধের শুরুতেই হওয়া উচিত ছিল। যদি যুদ্ধের শুরুতেই আমরা এটা করতে পারতাম, তাহলে যুদ্ধের ফল আরও ইতিবাচক হতো। এটা আরও বেশি ফলদায়ক ও কার্যকর হতো। পুরো মাত্রায় যুদ্ধ শুরু হলে যৌথ সামরিক নেতৃত্বের অধীনে সব বাহিনী যাবে বা থাকবে। এটা পৃথিবীর সব যুদ্ধের ইতিহাসেই রয়েছে। এটা আলাদা কোনো বিষয় নয়। কেবল আমাদের বেলায় যে এটা নতুন একটা কিছু, তাও নয়। এদিক থেকে আমি মনে করি, আমাদের বাংলাদেশ সরকার সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিল। ফলে আত্মসমর্পণটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে নয়, পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করেছিল ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সামরিক নেতৃত্বের কাছে।

মঈদুল হাসান : এখানে একটা কথা আমি যোগ করতে চাই। যৌথ সামরিক নেতৃত্বের যে প্রস্তাব, সেটা অক্টোবরে প্রবাসী মন্ত্রিপরিষদের কাছে বা মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রথমে পেশ করা হয়নি। কারণ, তখন আমাদের মন্ত্রিপরিষদ সব চেয়ে বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তির পর জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন ও বামপন্থীদের গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে মুক্তিবাহিনীতে নেওয়ার অনুমতি দিয়ে তাজউদ্দীন আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব খর্ব করতে চলেছেন, এমন প্রচার তখন আওয়ামী লীগের মধ্যে জোরেশোরে চলছিল। অক্টোবরে মন্ত্রিপরিষদের অধিকাংশ সদস্য তখন তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করে তাঁকে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব থেকে সরানোর জন্য উদ্যোগ নেন। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন উপাদান এবং মুজিব বাহিনীর সম্মিলিত রাজনৈতিক উদ্যোগ সমগ্র অবস্থাকেই নাজুক করে তোলে। এমন অবস্থায় ওসমানীর তীব্র বিরোধিতার পর যৌথ সামরিক নেতৃত্বের বিষয়টি তিনি আর মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করেননি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গতি যাতে ব্যাহত না হয়, অর্থাৎ দুই দেশের সামরিক তৎপরতার মধ্যে যাতে সমন্বয় থাকে, সে জন্য এক অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেন একক উদ্যোগে। এ ক্ষেত্রে ভারত সরকার তাঁকে সাহায্য করে।

যৌথ সামরিক নেতৃত্ব বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত যেটা হয়, সেটা অনেকটা ঘটে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর—সম্ভবত ৪ বা ৫ ডিসেম্বরে। বিষয়টি মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হয় এবং মন্ত্রিসভা বিষয়টিতে অনুমোদন দেয়। কিন্তু অক্টোবরে তাজউদ্দীনের নেওয়া প্রথম সিদ্ধান্তটি ছিল অনানুষ্ঠানিক। যেটাকে বলা যায়

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যুদ্ধ তৎপরতা পরিচালনায় সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য যৌথ নেতৃত্ব। এবং দ্বিতীয়টি উভয় দেশের মধ্যে দুই সেনাবাহিনীর একত্রে সামরিক বা যুদ্ধ তৎপরতা পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক যৌথ সামরিক নেতৃত্ব।

এ কে খন্দকার : এ বিষয়ে আমি একটি কথা বলতে চাই। যৌথ সামরিক নেতৃত্বের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদে আলোচনার মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছিল। এটা অন্য কোনো রকম অর্থেই হওয়া সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী করতে পারতেন তাঁর নিজের ক্ষমতাবলে; কিন্তু সেভাবে কিছু করা হয়নি। এটা করা হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে মন্ত্রিপরিষদের সবার মতামতের ভিত্তিতে।

অন্যান্য বাহিনী প্রসঙ্গ

মঈদুল হাসান : ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে দেশের ভেতরে অনেক বাহিনী গড়ে উঠেছিল। সেগুলোর মধ্যে কাদের বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলে বেশ কিছু বাহিনী গড়ে উঠেছিল। তারা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। দেশের অভ্যন্তরে যেসব বাহিনী যুদ্ধ করছিল, তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরের কোনো যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল কি না বা থাকলে কোন ধরনের যোগাযোগ কিংবা আপনাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল কি না?

এ কে খন্দকার : এসব বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠে। যেমন—কাদের বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, নোয়াখালীতে ছিল, যশোরে ছিল, বরিশাল এলাকায় ছিল। এভাবে যেসব বাহিনী গড়ে ওঠে, প্রথমে আমাদের একটু সময় লেগেছিল তাদের সম্পর্কে জানতে। তারা কী কাজ করছে, কীভাবে করছে, কেন করছে—এসব বিষয়ে খবর নিতে একটু সময় লেগে যায়। প্রথম দিকে একটা চেষ্টা করা হয়েছিল যে এসব বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব বাহিনীর নেতৃত্বের আওতায় নিয়ে আসা। কিন্তু এটা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কারণ তারা নিজেরাই এই বাহিনীগুলো গড়ে তুলেছিল। সুতরাং জোর করে তাদের বাংলাদেশ বাহিনীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসার কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। সে জন্য এই চিন্তা পরে পরিত্যাগ করা হয়। আমার সঙ্গে বিভিন্ন বাহিনীর অধিনায়কদের যোগাযোগ হয়েছে। আমি তাদের অনেকের সঙ্গেই দেখা করেছি। তারা আমার কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা চেয়েছে। সে সাহায্যগুলো করেছি আমরা আমাদের অবস্থা অনুযায়ী। তাই বলতে পারি, এসব বাহিনীর সঙ্গে আমাদের কোনো সময়ই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়নি বা বিরোধ দেখা দেয়নি।

যে বাহিনীর সঙ্গে সেক্টর অধিনায়কদের একটু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সে বাহিনীর ব্যাপারেও আমরা আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে মুজিব বাহিনী। তারা কী করেছিল তা পরে আলোচনা করব। এই যে বিভিন্ন বাহিনী, তারা কিন্তু নিজেরাই সৃষ্টি করেছিল স্থানীয় জনবল নিয়ে। আমি বলব যে তারা স্বাধীনভাবে আক্রমণ তৎপরতাগুলো চালালেও তাদের সেই আক্রমণ তৎপরতাগুলো অনেক জায়গায় বেশ ভালো হয়েছে। বিশেষ করে কাদের বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী। তবে তারা যুদ্ধকালে বাংলাদেশ বাহিনীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে সেভাবে আসেনি কখনো।

মঈদুল হাসান : বরিশাল অঞ্চলে ক্যাপ্টেন বেগ, ক্যাপ্টেন ওমর তাঁদের বাহিনী নিয়ে তৎপর ছিলেন বলে শুনেছি। তাঁদের সঙ্গে কি আপনাদের যোগাযোগ ছিল?

এ কে খন্দকার : তাঁদের সঙ্গে আমাদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ হয়নি। তবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষ এসে যোগাযোগ করেছে, সেই সূত্রেই আমরা জানতাম যে তাঁরা কোথায় কোথায় তৎপরতা চালাচ্ছেন বা করছেন। কিন্তু যেহেতু একটা সিদ্ধান্ত নেওয়াই হয়েছিল যে তাঁদের জোর করে কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের আওতায় আনা হবে না, তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় আমাদের আওতায় আসতে চায়, তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। অস্ত্র-গোলাবারুদ কিছু জায়গায় দেওয়া হয়েছে। এমনকি আমাদের কথায় রাজি হয়ে ভারতীয়রাও কিন্তু বহু অস্ত্র-গোলাবারুদ বিভিন্ন দলকে দিয়েছিল। তবে অস্ত্র দেওয়ার বিষয়টি আগেই শুরু হয়েছিল, কেবল বাংলাদেশ বাহিনী অনুমতি দেওয়ার পর দেওয়া শুরু হয়নি। তবে বাংলাদেশ বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং আমাদের দিক থেকে বলে দেওয়া হয় যে যদি তারা ওই সব দলকে অস্ত্র দিতে পারে, তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। অস্ত্র দেওয়া আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তারা এসব দলকে সরাসরি সব রকমের সাহায্য করত। সুতরাং তাদের তৎপরতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বাহিনীর তরফ থেকে কিংবা তাদের তরফ থেকে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি। তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছে এবং তাদের সে অবদানকে আমাদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত।

মঈদুল হাসান : বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছাকাছি কিছু গোপন দল সক্রিয় ছিল, যেমন নকশাল, সিরাজ সিকদারের দল, হক-তোহার দল—তাদের সম্পর্কে বা এ-জাতীয় দল সম্পর্কে আপনাদের কোনো ধারণা ছিল কি বা এ বিষয়ে আপনাদের সিদ্ধান্ত কি ছিল?

এ কে খন্দকার : না, এদের সম্পর্কে আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। তবে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে এদের কিছু লোক কিছু জায়গায় এমনভাবে কাজ

করত যে সেটা ঠিক আমাদের পক্ষে ছিল না। কিন্তু এসব তৎপরতা একটা বিরাট কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছে বলে আমাদের জানা নেই।

মঈদুল হাসান : দেশের অভ্যন্তরে যেসব বাহিনী কাজ করছিল, তাদের ব্যাপারে জেনারেল বি এন সরকারের মাধ্যমে আমি কিছু বিষয় সে সময় জেনেছিলাম। জেনারেল সরকার মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র বিষয় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। সে কথা আগেও বলেছি, তিনি কিছু বিষয় অবহিত করতেন আমাকে। আমি আগস্ট মাসের শেষের দিকে প্রথম শুনি কাদের সিদ্দিকীর কথা। তাঁরা টাঙ্গাইল এলাকায় কাজ করছেন। এই এলাকা তখন ময়মনসিংহ এলাকা বলে পরিচিত ছিল। আমাকে জেনারেল সরকার একদিন বললেন, 'বাংলাদেশের ভেতরে সংগ্রামরত কিছু বাহিনী সীমান্তে এসে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে। আমাদের একটা সিদ্ধান্ত রয়েছে তাদের সাহায্য করার।' তিনি জানালেন, 'কাদের সিদ্দিকী ভালো কাজ করছেন। আমরা তাঁদের ভারতে নিয়ে এসেছি। ওঁরা যুদ্ধ করে বেশ কোণঠাসা হয়ে গেছেন, ওঁদের পুনর্গঠন করার একটা চেষ্টা হচ্ছে।' অনেক পরে জেনেছিলাম যে কাদের সিদ্দিকী ও তাঁর দলের অনেককে ভারতে পুনঃপ্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন করে অস্ত্র সজ্জিত করা হয়। গোলাবারুদ দেওয়া হয়।

ভারত থেকে ফিরে এসে কাদের সিদ্দিকী তাঁর দলে নতুন ছেলেদের অন্তর্ভুক্ত করে সংখ্যা বাড়ান। এরপর তিনি ওই ছেলেদের নতুন করে অস্ত্র সজ্জিত করেন। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কাদের সিদ্দিকী দেশের ভেতর সবচেয়ে বড় প্রতিরোধশক্তি হিসেবে কাজ করেছেন, যে কারণে জেনারেল নাগরার বাহিনী ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে ঢাকায় সবার আগে চলে আসতে পারে—এটা খানিকটা ওখানে যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল, অর্থাৎ মধুপুর গড় অঞ্চলে—এর ফলে। ওখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী খুব একটা বেশি যেত না, যে কারণে জেনারেল নাগরা তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছাতে পারেন ঢাকার উপকণ্ঠে এবং তিনিই প্রথম পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজির কাছে বার্তা পাঠান আত্মসমর্পণ করার জন্য । সেসব ঘটনা তো সবাই জানি।

এই যে ছোট ছোট দল, যে দলগুলোকে পুনর্গঠন করা হয়েছে, সেটা সরাসরি ভারতীয় ফরমেশন থেকেই করা হতো। কাজেই ভেতরের যে প্রতিরোধ দলগুলো ছিল, তারা কতটা কী কাজ করেছে, কতটা অস্ত্র পেয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানিয়েছে কি না, সে সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। এ বিষয়ে এ কে খন্দকারই ভালো বলতে পারবেন।

এ কে খন্দকার : আমি যে কথা বলেছি যে কাদের বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী বা এমন কিছু দলের অস্তিত্ব বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানেই ছিল। তাদের সবার কথা আজ আমার স্পষ্ট মনে নেই। তবে বেশ কয়েকটি বাহিনী, যারা স্থানীয়ভাবে তৎপরতা চালাত, তাদের দু-চারজন আমাদের সঙ্গে দেখা করেছে বিভিন্ন সময়ে।

এখানে বলি, কর্নেল ওসমানী চেয়েছিলেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরের বাহিনী বা দলগুলোকে বাংলাদেশ বাহিনীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে বা আওতায় নিয়ে আসতে। সত্যি বলতে, এতে আমি সম্মত ছিলাম না। কারণ প্রথমত, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এরা নিজেরা যুদ্ধ করছে, নিজেদের আয়োজনে যুদ্ধ করছে, নিজেদের লোকবল নিয়ে যুদ্ধ করছে, এরা কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে আসতে চায় না। সুতরাং তাদের জোর করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আওতায় নিয়ে আসার কোনো অর্থ হয় না। আমি এভাবেই কর্নেল ওসমানীকে বিষয়টি সম্পর্কে বলি এবং শেষ পর্যন্ত এসব গ্রুপ বা বাহিনী স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। তবে এসব বাহিনী অনেক সময় অস্ত্রের জন্য আমাদের কাছে আসত। অস্ত্রের ব্যাপারে কিন্তু আমরাও আমাদের সদর দপ্তর থেকে ভারতীয় বাহিনীকে বলতাম যে এদের অস্ত্র দরকার, এদের অস্ত্র দেওয়া হোক। আমাদের বলার পরই যে তারা অস্ত্র দেওয়া শুরু করত তা নয়, আমাদের বলার আগে থেকেই ভারতীয়রা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তৎপরতারত দলের অনেককেই অস্ত্র দেওয়া শুরু করে। এ প্রসঙ্গে কাদের বাহিনীর কথা বলা যায়। তবে আমাদের বলার পর তাদের পক্ষে কাজটা সহজ ও যুক্তিগ্রাহ্য হলো। এটার মধ্যে আর কোনো অস্পষ্টতা রইল না বা কোনো সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকল না।

আমি নির্দ্বিধায় বলব, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসব দল তাদের সাধ্যমতো ভালো কাজ করেছে। বিশেষ করে কাদের বাহিনী সত্যি ভালো কাজ করেছে। টাঙ্গাইল অঞ্চলে, বিশেষত মধুপুর গড় এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী ঢুকতে খুবই দ্বিধা করত এবং এ অঞ্চলে তারা প্রবেশ করেছে বলেও শুনিনি। এটা প্রায় মুক্ত অঞ্চলই ছিল। মঈদুল হাসান যেটা বলেছেন, জেনারেল নাগরা কিন্তু এ পথেই সবার আগে ঢাকার উপকণ্ঠে তাঁর বাহিনী নিয়ে পৌঁছে যান। এর কারণ হলো, টাঙ্গাইল এলাকায় পাকিস্তানিদের তরফ থেকে কোনো বাধা তারা পায়নি। মধুপুর গড় এলাকাতেই ভারতীয় ছত্রীসেনাও নামানো হয়।

মঈদুল হাসান : ভারতীয়রা টাঙ্গাইল এলাকায় আকাশপথে ছত্রীসেনা নামিয়ে দেয়। অন্যদিকে নাগরার কয়েকটি ট্যাংক এই এলাকায় এসে সড়কপথে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়। ভারতীয় ছত্রীসেনারা সেখানে নেমেই আশপাশের জায়গা ও ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ পরিষ্কার করে। এ সময়টায় কিন্তু তারা কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীকে ব্যবহার করে এবং কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীও ভারতীয়দের সঙ্গে ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এ কে খন্দকার : আমি যে কথা বলছিলাম, অর্থাৎ টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলে যা মুক্ত অঞ্চল ছিল, সেখানে নাগরার বাহিনী পাকিস্তানিদের কাছ থেকে কোনো প্রকার বাধার সম্মুখীন হয়নি। কাদের বাহিনী তো তাদের সহযোগিতা করেছেই। সুতরাং

আমি আবারও বলব, দেশের অভ্যন্তরে যেসব গ্রুপ বা বাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ করেছে, সেটা যে একটা বিরাট কিছু তা নয়, তবে তাদের যে সমষ্টিগত অবদান, সে অবদান বেশ বড়ই হবে। আমাদের ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারের আওতায় মুক্তিযোদ্ধারা দেশের জন্য যেভাবে যুদ্ধ করেছে, দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা এসব বাহিনীও সেভাবে দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছে। তাদের অবদান ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

মঈদুল হাসান : ইন ফ্যাক্ট, অবদানের প্রসঙ্গই যখন এল, তাহলে আমি বলি, পাকিস্তানি অধিকৃত এলাকায় অর্থাৎ বাংলাদেশে সমস্ত মানুষ, তারা প্রথম দিকে ভীত, হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল, ভয়ে সরে ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে যখন দেখল যে না, একটা প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে, ভেতরে মুক্তিযোদ্ধারা আসছে, তখন দেশের মানুষ নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের আশ্রয় দিত, তাদের আহার দিত, আহত হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করত, তাদের পথ দেখাত, উৎসাহ দিত। আমরা যদিও দেশের অভ্যন্তরে একটা রাজনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে পারিনি, যে কারণে এটা সত্যিকার অর্থে একটা গেরিলা যুদ্ধ হয়ে ওঠেনি, তবু এটা ছিল বিশাল, জনসমর্থিত, স্বতঃস্ফূর্ত কমান্ডো রেডের মতো ব্যাপার। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা দেশের ভেতরে পাকিস্তানিদের প্রায় অচল করে ফেলেছিল। এটা হয়েছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের, যারা অধিকৃত এলাকায় ছিল তাদের সহযোগিতার ফলেই।

এটা না হলে মুক্তিযুদ্ধ কখনোই সফল হতো না। এই মানুষগুলো না হলে, মুক্তিযোদ্ধারা দেশের ভেতরে সফল না হলে, ভারতীয় বাহিনী এত তাড়াতাড়ি ঢাকায় পৌঁছাতে পারত—এটা আমি মনে করি না। কাজেই দেশের ভেতরে যেমন নানা প্রতিরোধ গ্রুপ, তেমনি নিরস্ত্র মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অবদান মুক্তিযুদ্ধের জন্য ছিল অপরিসীম।

এ কে খন্দকার : এসব বাহিনীর কথা যখন আমাদের বাংলাদেশ সরকার জানতে পারে, যেহেতু তারা যুদ্ধ করছে, সে জন্য বাংলাদেশ সরকার তাদের সেন্ট্রাল কমান্ডে নিয়ে আসার যে প্রাথমিক চিন্তা করেছিল, সেটা পরিত্যক্ত হয় এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসে। এই যে বাহিনী বা গ্রুপ, তারা যে দেশের অভ্যন্তরে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যেতে পেরেছিল, তার মূলে ছিল দেশের সাধারণ মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা আর পূর্ণ সমর্থন। জনগণের এই সমর্থন, সহযোগিতা ছাড়া এসব ছোট গ্রুপের পক্ষে কাজ করা সম্ভব ছিল না।

এসব গ্রুপের কাছে অস্ত্র কম ছিল। কোথাও কোথাও কিছু অস্ত্র তারা রাজাকার ও পাকিস্তানিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছিল। অপরদিকে ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকেও অস্ত্র পাচ্ছিল। তবে বিপুল পরিমাণে নয়। আমাদের পক্ষ

থেকে গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পর ভারতীয়দের কাছ থেকে বিপুল না হলেও বেশ কিছু অস্ত্র তারা পেয়েছিল।

এখানে একটি কথা বলব, যেটা মঈদুল হাসান বলেছেন। এই যুদ্ধটা কোনো দলীয় যুদ্ধ ছিল না, এটা ছিল ন্যাশনাল ওয়ার—জাতীয় যুদ্ধ। এখানে মুক্তিবাহিনীর কথা বলা হোক আর কোনো স্থানীয় বাহিনীর কথাই বলা হোক, যেমন কাদের বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী এবং অন্যান্য বাহিনীর ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষ যেভাবে ভীতির মধ্যে, একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে থেকে এই মুক্তিযুদ্ধকে সহযোগিতা করেছে, সেই সহযোগিতা না পেলে মুক্তিযোদ্ধারা বা অন্য কোনো বাহিনীই হোক না কেন, যেভাবে তারা যুদ্ধ করেছে, সেভাবে যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি এ কথা বলতে চাই যে যেহেতু এটা জাতীয় যুদ্ধ ছিল, সেহেতু বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে।

আমরা অনেক সময় কিছু বিষয় বুঝতে পারি না। অনেকে বলেন, ভারতীয় বাহিনী এসে যেদিন দেশকে স্বাধীন করল, সেদিন আমরা স্বাধীন হয়েছি। এটাও বাস্তব সত্য। তারা এসে যুদ্ধ করার পরই আমরা ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হলাম। কিন্তু এটাও সত্য কথা যে ভারতীয় বাহিনী হয়তো আসত না, যদি দেশের ভেতরে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি না হতো। যদি জনসাধারণ এই যুদ্ধকে সমর্থন না করত, যদি মুক্তিযোদ্ধারা সফল না হতো, তাহলে ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক সরকার এই যুদ্ধে আসত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের কারণে এবং দেশের অভ্যন্তরে মানুষের সার্বিক সহযোগিতার ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এমন অবস্থা হয়েছিল যে তাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মুভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। যেসব জায়গায় পাকিস্তানিরা মুভ করত, যেখানে এক কোম্পানি দরকার ছিল, সেখানে তারা তিন কোম্পানি নিয়ে মুভ করত।

এই যে যোগাযোগ, যাতায়াতের একটা দারুণ অনিশ্চয়তা দেখা দিল, ফলে তাদের পক্ষে ইনটেলিজেন্স সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তারা জানতে পারত না 'এ' পয়েন্ট থেকে 'বি' পয়েন্ট পর্যন্ত যেতে হলে কোথায় কোথায় বাধার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং কী ধরনের বাধা। এই ইনটেলিজেন্স সংবাদ না থাকার জন্যই কিন্তু তারা বহু জায়গায় তাদের পরিকল্পনামতো চলতে পারেনি। যেমন যশোর থেকে তারা মনে করেছিল যে একটা কম্বাইন্ড ওয়েতে ঢাকার দিকে ফিরে আসবে। কিন্তু পারেনি। তারা খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া—বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন পথে পালাতে আরম্ভ করে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে তারা কতখানি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

সে জন্য আমি আমার সীমিত সামরিক অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে যদিও ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ হয়, কিন্তু এই আত্মসমর্পণের কথা প্রথম ওঠে ৯ ডিসেম্বর,

আমার জানামতে। সুতরাং ৩ তারিখে শেষরাত থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। অর্থাৎ ৪ থেকে ৯ তারিখ—এই ছয় দিনের মাথায় ৯৩ হাজার সৈন্যের আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, সুশিক্ষিত ডিসিপ্লিনড একটা ফোর্স পরাভূত হয়, এমন ইতিহাস আমার জানা নেই। আর কোনো যুদ্ধে এ রকম হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এবং এটা সম্ভব হয়েছে কেবল বাংলাদেশের ভেতরে এমন একটা অবস্থা ছিল, যে অবস্থায় পাকিস্তানিদের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আর মোটেও সম্ভবপর ছিল না। সে জন্য তারা প্রথম থেকেই, অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর থেকেই আত্মসমর্পণের চেষ্টা করে। বিভিন্ন কারণে সংবাদ আদান-প্রদান এবং সর্বোপরি জাতিসংঘের কারণে শেষ পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের দিনটি চূড়ান্ত হয়। এই বিলম্ব না হলে আমার ধারণা, ৯ থেকে ১০ ডিসেম্বরই পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো।

মঈদুল হাসান : এখন মুজিব বাহিনী সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

এ কে খন্দকার : এ বাহিনী সম্পর্কে আমি প্রথম শুনি সম্ভবত জুন মাসে। কর্নেল ওসমানী সাহেবের অফিসে বিভিন্ন লোকের যাওয়া-আসা ছিল। তাদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, প্রধান সেনাপতি বা সিএনসির স্পেশাল ফোর্স বা বিশেষ বাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠিত হতে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমি কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না দিলেও তাঁর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে সত্যি একটা বিশেষ বাহিনী হতে যাচ্ছে, যা সিএনসির স্পেশাল ফোর্স নামে অভিহিত হবে। এই বাহিনী গঠনে তাঁর যে সম্মতি আছে, সেটাও আমি বুঝতে পারলাম।

এস আর মীর্জা : মুজিব বাহিনী প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের এক লেখায় উল্লেখ আছে, তোফায়েল আহমেদ কর্নেল ওসমানীকে প্রস্তাব দেন যে যদি তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তিনি বেশ ভালো ভালো ছেলে জোগাড় করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল ওসমানী বিষয়টিতে সম্মতি জানান এবং তোফায়েল আহমেদকে এ কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে একটি চিঠিও দেন।

মঈদুল হাসান : আসলে বিষয়টি ছিল—এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। লড়াই নতুন করে পুনর্গঠিত করতে হবে, এ জন্য অনেক যুবক ছেলে দরকার। দলের তরুণ নেতারা জানান যে তাঁরা দেশের অভ্যন্তর এবং বিভিন্ন শিবির থেকে

যুবকদের সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। প্রস্তাবটি ১৮ এপ্রিল নবগঠিত মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে। এবং শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদসহ চারজন যুবনেতাকে এ কাজটি করার জন্য ক্ষমতাও দেওয়া হয়। সে সময় মন্ত্রিসভা বা অন্য কারও মনে বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। মন্ত্রিসভার এ সিদ্ধান্তই কার্যকর করেন কর্নেল ওসমানী। তিনি এ-সংক্রান্ত চিঠিটিতে স্বাক্ষর করেন।

এ কে খন্দকার : এস আর মীর্জা যে চিঠির কথা বললেন, সেই চিঠি সম্পর্কে আমি জানতাম না। অন্যদিকে মঈদুল হাসান সাহেব যে কথা বললেন, সে সম্পর্কে আমার কিছুটা জানা ছিল। তবে আমি যেটুকু জানি সেটুকু বলছি, তখন ওসমানী সাহেবের কাছ থেকে কোনো আপত্তিকর কথা শুনিনি, বরং আমার মনে হয়েছিল যে এই প্রস্তাবে তাঁর পূর্ণ সম্মতি আছে, অর্থাৎ একটি বিশেষ বাহিনী গঠনে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। এরপর বেশ কিছুদিন এ সম্পর্কে আর কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি।

সম্ভবত জুলাই মাসের শেষ দিকে বা আগস্ট মাসের প্রথম দিকে দুজন প্রশিক্ষিত গেরিলা যোদ্ধা আমার সঙ্গে দেখা করেন—তাঁদের একজনের নাম ছিল মন্টু। তাঁরা বলেন, তাঁরা ভারতের এক স্থান থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন এবং তাঁরা মুজিব বাহিনীর সদস্য। আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করেছিলাম এ বাহিনী সম্পর্কে। আমি তাঁদের বলেছিলাম, 'এ বাহিনী সম্পর্কে আমার তো কিছু জানা নেই। তবে নিশ্চয়ই আপনারা সেক্টর অধিনায়কদের অধীনে আছেন বা থাকবেন।' তখন তাঁরা হেসে এর কোনো জবাব দেননি। এর কিছুদিন পর বিভিন্ন সেক্টর অধিনায়কের কাছ থেকে অভিযোগ আসতে শুরু করে যে তাঁদের সেক্টরে কিছু তরুণ নেতা, তরুণ গেরিলা যোদ্ধা গিয়ে তাঁদের সেক্টর থেকেই যাঁরা ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, তাঁদেরকে ওই নেতাদের নিজের দলে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। গেরিলা যোদ্ধা সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত করার পর তাঁদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো নিয়ে বা এই কার্যক্রম নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কিছু সংঘাত বা বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। সেক্টর অধিনায়কেরা জিজ্ঞেস করেছেন, এঁরা কারা এবং এঁদের কী অধিকার আছে—সে সম্পর্কে সরকারের কাছ থেকে জানতে চান। তাঁরা অভিযোগ করেন যে এমন অবস্থা চললে যুদ্ধ চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে। এমন অভিযোগ কর্নেল ওসমানীর কাছে একের পর এক আসতে থাকে বিভিন্ন সেক্টর থেকে।

এই সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল ওসমানী এই বাহিনীর ওপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তত দিনে প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে নতুন এই বাহিনী, য়া মুজিব বাহিনী নামে পরিচিত, তারা তাঁর নেতৃত্বের আওতায় বা অধীনে থাকতে রাজি নয়। কর্নেল ওসমানী বিষয়টি

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের গোচরীভূত করেন। মন্ত্রিসভাতেও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং সে আলোচনা বেশ উত্তপ্ত ছিল। মন্ত্রিসভায় যদিও বলা হয় যে বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের আওতায় এবং কেন্দ্রীয় ও একক নেতৃত্বের অধীনে থাকা উচিত, কিন্তু আমার মনে হয়নি মন্ত্রিসভার সব সদস্য এ বিষয়ে অন্তরে একমত পোষণ করেছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কোথায় যেন একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। আমার এ কথাও মনে হয়েছিল যে মন্ত্রিসভার কেউ কেউ বিষয়টি সম্পর্কে আগে থেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ সম্পর্কে প্রমাণপত্র হাজির করতে পারব না। তবে সে সময় তাঁদের কথাবার্তা থেকে যেটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, তাতে এমনই মনে হয়েছিল।

এই মুজিব বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে সে সময় সেক্টর অধিনায়কদের কাছ থেকে শুনে, জেনে এবং অন্যান্য উৎসে প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয়েছিল যে তাঁরা বর্তমান চলমান যুদ্ধের বিষয়ে যতটা না আগ্রহী, তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী বা তৎপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁদের করণীয় বা ভূমিকা নিয়ে। স্বাধীন দেশে তাঁদের যে একটা সামরিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা থাকবে, সে বিষয়টিও আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু কী সেই লক্ষ্য বা ভূমিকা, তা স্পষ্ট করে তখনো আমি জানতে পারিনি। এই বাহিনী সুনির্দিষ্টভাবে কোন কোন কাজ বা দায়িত্ব পালন করবে, সে সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল মুজিব বাহিনীকে প্রয়োজনে নানাভাবে ব্যবহার করা হবে।

মুজিব বাহিনীর সবাই যুদ্ধ করেছেন, এমন কথা বলা কঠিন। এই বাহিনীর নেতৃত্ব পর্যায়ের খুব কম সদস্যই যুদ্ধ করেছেন। তবে মুজিব বাহিনীর সাধারণ সদস্যরা কোথাও কোথাও খুব ভালো যুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধে বেশ কিছু সদস্য আহত বা নিহতও হয়েছেন। তবে মুজিব বাহিনীর বড় অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে বলে আমার জানা নেই।

আর একটি বিষয় লক্ষ করেছিলাম যে তারা যখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে আসছিল, তখন তাদের কাছে আমাদের সাধারণ গেরিলা যোদ্ধাদের তুলনায় অনেক বেশি এবং উন্নত মানের সমরাস্ত্র রয়েছে। পরে শুনেছিলাম যে উন্নত মানের অস্ত্র দেওয়ার বিষয়টি ভারত সরকারের অনুমতি নিয়েই করা হয়েছে। আসলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমতি ছাড়া অধিক পরিমাণে ও উন্নত ধরনের অস্ত্র দেওয়া সম্ভব ছিল না।

শত্রুপক্ষের পরিচালিত গোয়েন্দা তৎপরতার বিরুদ্ধে পাল্টা গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা (কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স) বিভাগের মেজর জেনারেল উবান, যিনি এ বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁর নেতৃত্বে ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জেনারেল উবানও এ বিষয়ে কিছু বলতে চাননি, যে কারণে এই বাহিনী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়নি। আমি যতটুকু জানি, এ বিষয়ে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে ভারতীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল

যে এমনটা কেন হলো। আমাদের না জানিয়ে কেনই বা এমন একটা বাহিনী গড়ে তোলা হলো। এসব প্রশ্নও দেখা দেয়। মুজিব বাহিনীর ফলে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে বেশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, তাও বলা হয়।

আমি শুনেছি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নাকি জানিয়েছিলেন যে তিনি এ বিষয়টি দেখবেন। আমি যত দূর জানতে পেরেছিলাম, ভারত সরকার এ বিষয়ে তেমন কিছু আর করেনি। আমার মনে হয়েছে, সম্ভবত তারাও চেয়েছে যে মুজিব বাহিনী নামের যে বাহিনী, সেটা থাকুক এবং কাজ করুক। আমার আরও মনে হয়েছে, সেই সময় ভারতে যে নকশাল আন্দোলন চলছিল এবং সে আন্দোলন ক্রমশ বেশ জোরদার হয়ে উঠছিল, তৎপর ছিল। এর ফলে গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ যদি বামপন্থী হয়ে যায়, নকশাল আন্দোলনের প্রতি যদি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে, তাহলে ভারত সরকার মুজিব বাহিনীকে নকশালিদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করবে। তা ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও যদি বামপন্থীদের হাতে চলে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়, তাহলে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হবে। যে কারণে ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও এমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি, যাতে সৃষ্ট সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধানে আসা যায়। আসলে মুজিব বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের বা বাংলাদেশ বাহিনীর নেতৃত্বের আওতায় আসুক, এটাও বোধহয় ভারত সরকার চায়নি তাদের কৌশলগত কারণেই।

এই যে বাহিনীর মধ্যে বিভেদ এবং যে কারণে আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের মধ্যে ক্ষোভ, কেবল সেক্টর অধিনায়কদেরই নয়, অন্যদের মনেও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল, বিশেষ করে কর্নেল ওসমানী বারবার বলেছেন যে সমস্ত বাহিনী অর্থাৎ নিয়মিত বাহিনীসহ গেরিলা ও মুজিব বাহিনী কেন কেন্দ্রীয় সামরিক নেতৃত্বের আওতায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকবে না? তিনি চেয়েছেন যে বাংলাদেশের সমস্ত বাহিনী তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকুক। এই ক্ষোভটা তাঁর ছিল এবং তা যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি ছিল।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। তখন যে অভিযোগগুলো আসত, তার সবই যে লিখিত আকারে আসত তা নয়, মৌখিকভাবেও জানানো হতো। আসলে ওই সময় তো আমাদের সব রকমের সুবিধা ছিল না। সব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং সেই কাঠামো সচল রাখার জন্য যে লোকবল ও অন্যান্য সহযোগিতা দরকার ছিল, তা সব ক্ষেত্রে পাওয়াও সম্ভব ছিল না। মুজিব বাহিনী সম্পর্কে অভিযোগ আসত সেক্টর অধিনায়ক, সাব-সেক্টর অধিনায়ক, এমনকি সাধারণ গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকেও। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে এই বাহিনীর অনেক সদস্যই জোর করে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করানোর চেষ্টা করতেন তাঁদের দলের হয়ে কাজ করার জন্য; জোর করে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেন বা কোনো কোনো জায়গায় করেছেনও এবং কোনো কোনো স্থানে যে

লক্ষ্যবস্তুতে বা লক্ষ্যে আমাদের গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের যাওয়ার কথা, সেই লক্ষ্য থেকে তাঁদের বিচ্যুত করে অন্য লক্ষ্যে নিয়ে গেছেন। এমন ঘটনা সেক্টর এলাকা, সীমান্ত, এমনকি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ঘটেছিল।

মুজিব বাহিনীর সঙ্গে আমার বা বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরের কোনো যোগাযোগ ছিল না। এই বাহিনী সম্পূর্ণ পৃথকভাবে তৎপরতা চালাত, যা আমরা জানতাম না। যুদ্ধ চলাকালে, এমনকি চূড়ান্ত যুদ্ধের সময়ও আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়েই উঠেছিল যে এই বাহিনী তাদের সম্পূর্ণ শক্তি অটুট রাখার চেষ্টা করছে, যাতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মুজিব বাহিনীকে এত গোপনে প্রশিক্ষণ ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল এবং এত গোপনে তাদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছিল যে এই বাহিনীর কার্যক্রম বা এদের উপস্থিতি অনেক পরে আমরা জানতে পারি, তাও সম্পূর্ণ নয়; ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে আমরা বিভিন্ন সেক্টর থেকে জানতে পারি। আমার সঙ্গে প্রথম যে দুজনের সাক্ষাৎ হয়—তাঁদের একজন মন্টু, অপরজন খসরু সম্ভবত। তাঁরা আমার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করেছিলেন। সেদিন তাঁরা আমাকে বলেছিলেন যে তাঁরা আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে নন। ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বাহিনীর সংখ্যা প্রথমে ধারণা হয়েছিল চার হাজার। কিন্তু পরে এই সংখ্যা জেনেছি যে নয় থেকে ১২ হাজার। আমি সঠিক সংখ্যা বলতে পারব না।

এস আর মীর্জা : মুজিব বাহিনীতে একটি বিষয় লক্ষ করেছি, এই বাহিনীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবার ছাড়া কোনো গরিব কিংবা চাষি পরিবারের ছেলেদের নেওয়া হয়নি। কোনো শ্রমজীবী মানুষকেও এই বাহিনীতে নেওয়া হয়নি। তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল এই আন্দোলন বা যুদ্ধ যাতে বামপন্থীদের হাতে চলে না যায়। সে জন্যই কোনো গরিব মজদুর, চাষি বা সাধারণ ঘরের মানুষকে নেওয়া হয়নি। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের যে গেরিলা বা গণবাহিনী সার্বিকভাবে মুক্তিযোদ্ধা, তাদের ৭০ ভাগই ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষত কৃষক পরিবারের।

আমি মুজিব বাহিনীর বেশ কিছু সদস্যের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা সবাই বেশ ভালো, শিক্ষিত, সচ্ছল পরিবারের ছেলে। বিভিন্ন এলাকা থেকে মুজিব বাহিনীতে যেসব ছেলে নেওয়া হয়, সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারিনি বা জানতে দেওয়া হয়নি। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গেই এ কাজটি করা হয়। যদিও আমি যুব শিবিরের মহাপরিচালক ছিলাম, তথাপি আমাকে কিছুই বলা হয়নি বা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রাখা হয়নি। আমার মনে হয়েছে, যুব অভ্যর্থনা শিবিরে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগেই ওই ছেলেদের বাছাই করা হয়েছে। বিভিন্ন যুব শিবির, শরণার্থী শিবিরসহ অন্যান্য নানা শিবিরে এমপিএ-এমএনএরা যাচ্ছেন, থাকছেন।

কিন্তু তাঁরা বা তাঁদের কেউ মুজিব বাহিনীর জন্য সদস্য বাছাই করছেন, সে সম্পর্কে তাঁরা কোনো দিনও কিছু বলেননি।

এ বিষয়টি আমি জেনেছি অনেক পরে, যখন মুজিব বাহিনীর ছেলেরা প্রশিক্ষণ শেষ করলে সেক্টরের মাধ্যমে তাদের দেশের ভেতরে পাঠানো শুরু হলো। কাজটি করা হয় সেক্টর অধিনায়কদের না জানিয়ে। আর তখনই আমরা বিভিন্ন সেক্টর থেকে খবর পেলাম মুজিব বাহিনী সম্পর্কে।

এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ এটা ছিল জনযুদ্ধ। সুতরাং এর মধ্যে আলাদা কোনো বাহিনী গঠনের যৌক্তিকতা আমি দেখি না। পরে এই বাহিনী যে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, সেটাও আমার মনে হয়েছিল। এই যুদ্ধ যদি দীর্ঘায়িত হতো, তাহলে যুদ্ধের নেতৃত্ব হয়তো বামপন্থীদের হাতে চলে যেত। নেতৃত্ব যাতে বামপন্থীদের হাতে না যেতে পারে, সে জন্যই হয়তো মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি। আমি অনেক গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে শুনেছি যে মুজিব বাহিনীর অনেক সদস্যই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাঁরা বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অনেককে হত্যা করেছেন। এমনকি বাম রাজনীতি করেন, এমন সন্দেহের বশবর্তী হয়েও অনেককে হত্যা করা হয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল উবান ছিলেন শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা তৎপরতার বিরুদ্ধে পাল্টা গোয়েন্দা তৎপরতা চালানোয় এবং শত্রু বা অন্য দেশের বিদ্রোহী বাহিনী পরিচালনায় একজন বিশেষজ্ঞ। বিশেষত শত্রুদেশের বিদ্রোহীদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বা নিজেদের অধীনে রেখে তাদের প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে ও দমিয়ে রাখতে হয়, সে বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই উবানই প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন মুজিব বাহিনীকে। তার অর্থ দাঁড়াল যে স্বাধীনতার পর যদি দরকার পড়ে, তাহলে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হবে অন্য সব গেরিলাকে দমন করার জন্য। তার মানে তারা ছিল ডানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল একটি বাহিনী।

মঈদুল হাসান : এটা ছিল একটা স্বতন্ত্র বাহিনী। বাংলাদেশ সরকারের অধীনে অভিন্ন একটা সামরিক নেতৃত্ব-কাঠামো হয়েছিল, যার অধীনে বাংলাদেশ বাহিনী বা নিয়মিত বাহিনী পুনর্গঠিত করা হয় এবং গেরিলা যোদ্ধা তথা এফএফ ও অনিয়মিত বাহিনীর জন্য উৎসাহী যুবকদের বাছাই করে, প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশের ভেতরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। সমগ্র কাজটি বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর নিয়ন্ত্রণ করত। আর বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর দায়বদ্ধ ছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাছে, যেটার দায়িত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নিজেই। আবার তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন মন্ত্রিসভার কাছে। অন্যদিকে মুজিব বাহিনী ছিল বাংলাদেশ সরকারের যে প্রতিষ্ঠিত কাঠামো তার বাইরে। এটার কথা গোপনই ছিল, কেননা বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। যখন জানা

গেল যে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ) তথা মুজিব বাহিনী নামের আরও একটি বাহিনী আছে এবং এই বাহিনী কাজ করছে, তখন কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করতে চাননি, কারণ এই মুজিব বাহিনীর যে চারজন নেতা ছিলেন—শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ—তাঁরা আওয়ামী লীগের তরুণ ও যুব প্রজন্মের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং শেখ মুজিবের আস্থাভাজন অনুসারী হিসেবে প্রত্যেকেই পরিচিত।

১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যাঁরা এমএনএ-এমপিএ হিসেবে জয়ী হয়ে আসেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নব্য আওয়ামী লীগার, যাঁরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করতেন এবং নির্বাচন করার মতো যাঁদের পয়সাকড়ি ছিল। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের চরিত্রটা এমন ছিল না যে এঁরা মুক্তিযুদ্ধ করবেন। এঁরা এমএনএ বা এমপিএ হওয়ার জন্যই আওয়ামী লীগে এসেছিলেন। এঁদের অন্য কোনো অঙ্গীকার ছিল না। স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হবে, এমন বোধও তাঁদের মধ্যে কাজ করেনি। তাঁদের কাছে ছয় দফা পর্যন্ত ঠিক ছিল।

মার্চ মাস থেকে পাকিস্তান যখন সামরিক আঘাতের দিকে এগোতে থাকে, তখন আওয়ামী লীগের এই দোদুল্যমান এমএনএ-এমপিএরা একটু অসহায় অবস্থায় পড়ে যান। ফলে দলের শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য সেই পুরোনো যুবনেতারাই দলের মুখ্য ভূমিকায় চলে আসেন। ২৫ মার্চ ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর নির্বাচিত এমএনএ-এমপিএদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ সীমান্তও অতিক্রম করেননি; যাননি মুক্তিযুদ্ধে। নির্বাচিত এমএনএ-এপিএদের প্রায় অর্ধেকই পূর্ব পাকিস্তানে কিছুকাল গা ঢাকা দিয়ে থাকলেন। তারপর সেপ্টেম্বরে তথাকথিত সাধারণ ক্ষমার অধীনে তাঁদের কিছুসংখ্যক আত্মসমর্পণ করলেন পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে, বাকিরা গা ঢাকা দিয়েই থাকলেন।

আমি বোধহয় আগেও বলেছি, ২৫-২৬ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমান যে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী হবেন, তিনি যে বাড়িতেই থাকবেন—এই সিদ্ধান্তটা তিনি দলের নেতৃস্থানীয় কারও সঙ্গে আলাপ করেননি। তেমনি বলে যাননি যে তিনি না থাকলে কে বা কারা নেতৃত্ব দেবে এবং কোন লক্ষ্যে কাজ করবেন। নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কি কোনো আলাদা কমিটি হবে? তাঁদের কৌশলটা কী হবে? এঁদের কি কোনো কর্মসূচি থাকবে? সেখানে দলের প্রবীণদের কী ভূমিকা হবে, তরুণদেরই বা কী ভূমিকা হবে—এসব কোনো প্রশ্নের উত্তরই কারও জানা ছিল না। তাজউদ্দীন আহমদ ২৪ অথবা ২৫ মার্চ কথা প্রসঙ্গে কেবল শুনেছিলেন যে কোনো বিপদ দেখা দিলে কলকাতার ভবানীপুরের একটি বাড়িতে বরিশালের প্রাক্তন এমপিএ চিত্তরঞ্জন সুতার যেখানে থাকতেন সেখানে দলের তরুণ নেতারা গিয়ে উঠবেন।

১ এপ্রিল কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার আগে সেই ঠিকানায় তাজউদ্দীন আহমদ গিয়েছিলেনও তাঁদের খোঁজে। কিন্তু কারও সাক্ষাৎ পাননি। পুনরায় দিল্লি থেকে ফিরে এসে ৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় তিনি সেখানে আবার যান। তখন যুবনেতা ও তাঁদের সমর্থক ছাড়াও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতার সাক্ষাৎ পান তিনি। কামরুজ্জামান তাঁদের মধ্যে একজন। ভবানীপুরের গাজা পার্কের কাছে রাজেন্দ্র রোডের বড় বাড়িটা ছিল ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড এনালিসিস উইং (RAW)-'র'-এর একটা অফিস ও অতিথি ভবন। সেখানে কেবল যুবনেতারা নন, তাঁদের সমন্বয়কারী 'র'-এর প্রতিনিধি চিত্তরঞ্জন সুতারও থাকতেন। কাজেই তাজউদ্দীনের দিল্লি সফরের কথা ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছেছিল। ওখানে গিয়েই তাজউদ্দীন পড়েন তাঁদের তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দার মুখে। কে তাঁকে দিল্লি যেতে বলেছে, কোন অধিকারে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করছেন ইত্যাদি। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এবং জ্যেষ্ঠদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র তাজউদ্দীনের উদ্যোগ সমর্থন করেন। যুবনেতাদের কটূক্তি ও নিন্দার মুখে উত্তেজিত না হয়ে তাজউদ্দীন তাঁদের জানান, দিল্লিতে সর্বোচ্চ মহলে আলাপ-আলোচনার ফলে একটা সমঝোতায় আসা গেছে। এর ভিত্তিতে স্বাধীনতার পক্ষে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হবে, তা আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হবে ১১ এপ্রিল। কিন্তু সেই যুবনেতারা চিত্তরঞ্জন সুতারের সহায়তায় কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের কাছে তাজউদ্দীনের বেতার-বক্তৃতা বন্ধ করার দাবি পাঠিয়ে দেন। কয়েকজন এমএনএ-এমপিএ এই দাবিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

এসব ঘটেছে আমি ভারতে যাওয়ার এক মাস আগে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতে যাওয়ার পর ওই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আমি দিল্লিতে ভারত সরকারের সঙ্গে পলিসি সমন্বয়ের একটা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত হয়ে পড়ি। জুলাই নাগাদ আমি এ জন্য প্রায় প্রতিদিন ভোর সাড়ে ছয়টায় তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে মিলিত হতাম। ওই মাসের মাঝামাঝি সময় তিনিই মুজিব বাহিনীর বিষয়টি প্রথম উত্থাপন করেন। অবশ্য এর আগেই বিভিন্ন সূত্রে আমি জেনেছিলাম, শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান প্রমুখ যুবনেতার মাধ্যমে পরিচালিত এমন একটি বিশেষ বাহিনী আছে, যারা আমাদের সরকার বা সামরিক নেতৃত্বের অধীন নয়। বরং তারা শুরু থেকেই এই মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধী এবং তাদের কার্যকলাপ যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। তাজউদ্দীন জানালেন, ওসমানী সাহেব তো বলেছিলেন যে এই বিশেষ বাহিনী তাঁর অধীনেই থাকবে। তা তো হলোই না, অধিকন্তু এই সরকার অবৈধ, বঙ্গবন্ধুর অনুমোদন না নিয়েই এটা গঠন করা হয়েছে এবং অবিলম্বে তা ভেঙে দেওয়া উচিত—এই মর্মে তারা রাজনৈতিক প্রচারণা শুরু করেছে।

এস আর মীর্জা : মুজিব বাহিনী সম্পর্কে আমি প্রথম জানতে পারলাম, যখন আমাদের সেক্টর অধিনায়কদের কাছ থেকে এই বাহিনী সম্পর্কে নানা অভিযোগ

মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে আসতে লাগল। তাঁরা জানালেন, এরা কারা, কেনই বা তারা এখানে এসেছে, আমরাই তো যুদ্ধ করছি, আমাদের গেরিলা যোদ্ধাও রয়েছে, নিয়মিত যোদ্ধাও আছে। তাহলে তাদের কী ভূমিকা? তাদের কার্যক্রম বন্ধ করা দরকার। মুজিব বাহিনী নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে। উপ-সেক্টর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা আমাকে বলেছিলেন, এক রাতে, যখন মুজিব বাহিনীর একটি দল তাঁর এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তখন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) তাদের আটক করে বন্দী করে রাখে সারা রাত। এমন অসংখ্য ঘটনা তখন ঘটেছিল।

এ কে খন্দকার : মুজিব বাহিনীর ব্যাপারটা অনেকেরই অজানা ছিল এ কারণে যে, এই সংগঠনটি অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে করা হয়েছিল এবং গোপনীয় রাখাও হয়েছিল। আমার ধারণা, মুজিব বাহিনীর যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদের একটা বড় সংখ্যা এ সম্পর্কে কিছু জানত না। মুজিব বাহিনীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রধানত এর যে নেতৃত্ব, তাঁদের মধ্যেই স্বচ্ছ ধারণা ছিল। নিচের দিকে এই বাহিনীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। অথচ যুদ্ধটা এই নিচের দিকের ছেলেরাই করেছে। এদের অনেকেই যুদ্ধে আহত হয়েছে, যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সুতরাং এটুকু বলতে পারি যে গোপনীয়তার জন্যই তখন এই বাহিনী সম্পর্কে বেশি কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

মঈদুল হাসান : আমি বলছিলাম, মুজিব বাহিনী নিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। জুলাই মাসে আমি দিল্লি যাওয়ার সময় তিনি মুজিব বাহিনীর কথা তোলেন। সেই সময় হেনরি কিসিঞ্জার দিল্লি ঘুরে গেছেন। কিসিঞ্জার এরপর পাকিস্তান থেকে গোপনে চীন সফর করে এসেছেন। ভারতে তখন সেটা নিয়ে বেশ হইচই। এ অবস্থায় আমি যখন দিল্লি যাচ্ছি তখন অন্যান্য কাজের সঙ্গে মুজিব বাহিনী সম্পর্কে ভালো করে জেনে আসার কথা তাজউদ্দীন আহমদ বললেন। আমি তখনো এদের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই বাহিনী সম্পর্কে। তিনি বললেন দেরাদুনের কাছে চাকরাতা নামক বিশেষ ঘাঁটিতে এদের স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণের কথা; এদের স্বতন্ত্র নেতৃত্ব গঠনের কথা; বাংলাদেশের সামরিক নেতৃত্বের বাইরে থেকে এরা সামরিক তৎপরতায় যুক্ত হয়েছে এবং সেক্টর বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এদের মতবিরোধ ও সংঘর্ষের কথা—এমনকি সূচনায় কী ঘটেছিল সে সম্পর্কেও কিছু কথা।

কিন্তু সেবার দিল্লিতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কারও সঙ্গে মুজিব বাহিনী নিয়ে বিশেষভাবে কথা বলার সুযোগ আমার হয়নি। আমি এ সময় বেশি দিন দিল্লিতে ছিলাম না। বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রধান সমন্বয়ক পি এন হাকসার তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের যে আলোচনা চলছিল সে ব্যাপারে

আমাকে কিছু আশাব্যঞ্জক অগ্রগতির সংবাদ দেন। ফলে আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য দ্রুত কলকাতায় ফিরে আসি।

তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, মুজিব বাহিনীর কার্যকলাপের গভীরতা সম্পর্কে তেমন কিছু না জানায় বিষয়টিকে তখনো আমি ততটা গুরুত্ব দিইনি। কারণ আমি দেখতাম, আওয়ামী লীগের ভেতরে আরও অনেক উপদল আছে, যারা তাদের উপদলীয় স্বার্থ নিয়ে সারাক্ষণ কাজকর্ম করে চলেছে। তাদের প্রায় প্রত্যেক নেতারই আলাদা দপ্তর রয়েছে। তাদের টাকা-পয়সাও বিস্তর আছে। সর্বোপরি প্রত্যেকেই আলাদাভাবে মনে করেন যে তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, যাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং তরুণ এই সব নেতাও যদি এমন একটা কিছু ভাবেন বা করেন, তাহলে সেটা বিস্মিত হওয়ার মতো ব্যাপার নয়।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি মুজিব বাহিনী নিয়ে নানা মহল থেকে আরও জোরেশোরে কথা উঠতে শুরু করে। অনেক এলাকা থেকেই খবর আসতে শুরু করল, অস্ত্রের মুখে বল প্রয়োগ করে তারা সাধারণ গেরিলা যোদ্ধাদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছে। ফলে সংঘাতও ঘটছে। সেই সঙ্গে তারা এমন প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে তারাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মনোনীত আসল মুক্তিযোদ্ধা এবং তাজউদ্দীন আহমদ চক্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে যাতে দেশদ্রোহের অভিযোগে পাকিস্তানিরা মৃত্যুদণ্ড দেয়, সেই জন্যই সরকার গঠনের ব্যবস্থা করছেন তাজউদ্দীন। অন্যদিকে মন্ত্রিসভা, প্রধান সেনাপতি, নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের তিনি এমন নানা বিভ্রান্তিতে ফেলে রেখেছেন, যার ফলে ভারত সরকার কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি স্বীকৃতি জানাবে না। তাঁদের নেতৃত্বে দেশে ফেরার পথ ক্রমেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, কাজেই মুজিব বাহিনীতে যোগ দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ তোমাদের সামনে নেই।

আগস্টের মাঝামাঝি তাজউদ্দীন আহমদ আমার কাছে পুনরায় প্রসঙ্গটি তোলেন। এর এক দিন আগে তিনি দিল্লি থেকে ফিরে এসেছেন। মুজিব বাহিনীর উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক প্রচারণা নিয়ে পি এন হাকসার ও 'র' প্রধান আর এন কাওয়ের সঙ্গে তিনি আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলেন বলে উল্লেখ করলেন। তাঁদের কাছে স্পষ্ট অভিযোগ করে তিনি বলেন, মনে হয় ভারত সরকারের কোনো একটি অংশের প্রশ্রয়েই মুজিব বাহিনীর নেতারা এই সব কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন; যার প্রতিবিধান হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু হাকসার ও কাও, দুজনই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকেন। ফলে বিষয়টি তাজউদ্দীন আহমদের জন্য হয়ে দাঁড়ায় বেশ উৎকণ্ঠার। ভারত সরকার একদিকে বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে চলেছে, অন্যদিকে মুজিব বাহিনীকেও সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে চলেছে। ফলে ভারত সরকার আসলে কী চায় তা পুরোপুরি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

তাজউদ্দীন এই মুজিব বাহিনীকে কারা, কীভাবে এবং কোন উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ করে সে সম্পর্কে আমাকে খোঁজখবর নেওয়ার অনুরোধ করেন পুনরায়। ভারতের শাসনক্ষমতার উচ্চ স্তরে দক্ষিণ ও বাম দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ইতিপূর্বেই আমাদের হয়েছিল। দেখা গেল, মুজিব বাহিনীকে সত্যি নিয়ন্ত্রণ করে 'রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং' (RAW)—'র', যারা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেরই অংশ। বৈদেশিক গোয়েন্দাতথ্য সংগ্রহ করাই 'র'-এর প্রধান কাজ। বিশেষ সামরিক তৎপরতা চালানোর মতো এদের কিছু নিজস্ব ক্ষমতা তথা বিশেষ বাহিনী আছে। 'র'-এর পূর্বসূরি বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার নাম ছিল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আইবি)। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পর চীন অধিকৃত তিব্বতে গেরিলা তৎপরতা চালানোর জন্য দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বত থেকে পালিয়ে আসা তিব্বতি বিদ্রোহীদের নিয়ে একটা কমান্ডো বাহিনী তৈরি করা হয়। নাম দেওয়া হয় 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স' (এসএফএফ)। এই বাহিনী গড়ে তোলায় সমস্ত আর্থিক, অস্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা দেয় আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। মেজর জেনারেল এস এস উবানকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাউন্টেন ডিভিশন থেকে এনে দায়িত্ব দেওয়া হয় এসএফএফ গড়ে তোলার। তখন উবানের পদবি ছিল ব্রিগেডিয়ার। আমেরিকার প্রশিক্ষকদের বড় একটি দল প্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আলাদা ঘাঁটি তৈরি করে দেরাদুনের অদূরে। সিআইএ এই কমান্ডো ফোর্সকে যেসব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে তা ভারতের সেনাবাহিনীরও ছিল না। চাকরাতার প্রশিক্ষণ ঘাঁটি—যেখানে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ হতো—সেটা ছিল সিআইএর তৈরি করে দেওয়া। সম্ভবত আগ্রার কাছে এসএফএফের একটা বিশেষ বিমান উইংও ছিল। এসএফএফ যে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত সেই আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্রই মুজিব বাহিনীর সদস্যদের হাতে দেখা যেত এবং তাদের নেতারা সেই বিশেষ সংস্থার চার্টার্ড প্লেনে ঘোরাফেরা করেন এমন সংবাদও মাঝেমধ্যে পাওয়া যেত।

ভারতের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র অবশ্য আমাকে কৌতুক করেই বলেছিলেন, তিব্বতের কোথাও কোনো সময় এই এসএফএফ সামান্যতম চাঞ্চল্যও ঘটাতে পারেনি। যা-ই হোক, সেই মেজর জেনারেল উবানই এখন তাঁর দ্বিতীয় স্পেশাল ফোর্স মুজিব বাহিনী গঠন করছেন শুনেছি। দেখা যাক উবান এবার কী তৈরি করেন! উবান ছিলেন স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের আইজি অর্থাৎ ইন্সপেক্টর জেনারেল।

আগস্ট মাসের শেষ দিকে দিল্লি থেকে পি এন হাকসার আমাকে খবর পাঠান, বাংলাদেশের দায়িত্বে নিযুক্ত হতে চলেছেন ডি পি ধর, যিনি মস্কোতে তখনো রাষ্ট্রদূত। আমাকে বলা হলো, ডি পি ধর কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট ছিল সকাল সাড়ে ১০টায়। তিনি

হোটেল হিন্দুস্তানে উঠেছিলেন। আর আমি থাকতাম গোলপার্কে। সেদিন এমন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল যে যাওয়ার জন্য আমি কোনো ট্যাক্সি পাচ্ছিলাম না। আমি সময়মতো পৌঁছাতে পারিনি। আমি যখন পৌঁছালাম তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন ডি পি ধর। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো ঠিক এর পরই, বেলা সাড়ে ১২টায়।

আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যকে মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে আনার ব্যাপারে প্রায় তিন মাস আমার যে আলোচনা চলছিল পি এন হাকসারের সঙ্গে—বিশেষ করে ওই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য স্বাধীনতার সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলোর সমবায়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নে—তারই ধারাবাহিকতায় সেদিন ডি পি ধরের সঙ্গে আলোচনা হয়। ডি পি ধর চার দিন কলকাতায় ছিলেন। ২৯ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর—এই চার দিনে মোট পাঁচবার আমি তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসেছি—যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি *মূলধারা '৭১*-এ দিয়েছি। শেষ দিনের আলোচনায় আমি ডি পি ধরের কাছে প্রথমবারের মতো মুজিব বাহিনীর বিষয়টি উত্থাপন করি। আমি মুজিব বাহিনীর সর্বশেষ কার্যকলাপের বিবরণ তুলে ধরে বলি, যে বিবেচনা থেকেই এই বাহিনীর স্বতন্ত্র নেতৃত্ব তৈরি করা হয়ে থাকুক, তা কার্যক্ষেত্রে আওয়ামী লীগকে ক্রমান্বয়ে আরও খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনৈক্য ও সংঘাত বাড়ছে। এরই প্রভাবে আরও বাড়ছে মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ। কাজেই এই বাহিনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করার জন্য একে বাংলাদেশ বাহিনীর নেতৃত্বের অধীনে আনা দরকার। ডি পি ধর জিজ্ঞেস করলেন, 'মুজিব বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে আনার ব্যাপারে তাজউদ্দীনের এই দৃষ্টিভঙ্গি কি মন্ত্রিসভার আর কেউ সমর্থন করেন?' আমি বললাম, 'বোধহয় আন্তরিকতার সঙ্গে কেউ করেন না। তবে কর্নেল ওসমানী দৃঢ়ভাবেই তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। ওসমানী বিষয়টিকে দেখেন পেশাদার অধিনায়কের দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি মনে করেন, বর্তমান অবস্থা ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব-কাঠামোর বিরোধী।' আমাকে অবাক করে দিয়ে ডি পি ধর প্রায় স্পষ্টভাবেই বললেন, যে সংস্থার হাতে মুজিব বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তাদের হাত থেকে এদের বের করে আনা বেশ জটিল কাজ। এ সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন 'র'-এর প্রধান রামনাথ কাও এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য অবশ্যই কোনো একজনকে তাজউদ্দীন আহমদের পাঠানো উচিত। সেদিনই তাজউদ্দীন আহমদের কাছে আমি ডি পি ধরের অভিমত তুলে ধরি। তিনি বললেন, 'আপনাকেই তাহলে দিল্লি যেতে হবে।'

কিন্তু হাতে এর চেয়ে কিছু জরুরি কাজ থাকায় দিল্লি যেতে আমার দেরি হয়। ৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ার পরই আমি দিল্লি যেতে পারি। ডি পি ধর 'র'-এর প্রধান কাওয়ের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। আমি সেখানে

পৌঁছানোর পরদিনই সেই বৈঠক হয়। আমি দিল্লিতে থাকতাম অশোক মিত্রর বাড়িতে। আমাদের জন্য ভারতের সরকারি মহলের অনেক মূল্যবান খবরই তাঁর কাছে পাওয়া যেত।

পরদিন অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর বৈঠক হয় 'র'-এর প্রধান রামনাথ কাওয়ের সঙ্গে সাউথ ব্লকে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অফিসের সামনে করিডর দিয়ে এগোলে পি এন হাকসারের অফিস, আর একটু এগোলোই কাওয়ের অফিস ছিল। এর আগে জুন মাসে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। কিন্তু বড় একটা কথা হয়নি। এবারও প্রায় তা-ই। আমি মুজিব বাহিনী সম্পর্কে যেমনভাবে সারসংক্ষেপ তৈরি করেছিলাম, যেটা তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলোচনা করেই করা হয়েছিল, সে অনুযায়ী বিষয়টি উপস্থাপন করি। আমি বলেছিলাম যে এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশের কোনো একক বাহিনী গঠন করা এবং কার্যকর লড়াই চালানো সম্ভব হবে না। ফলে মুক্তিযুদ্ধ যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে, তা এখন স্পষ্ট। কাজেই মুজিব বাহিনীকে যথাশিগগির বাংলাদেশ বাহিনীর নেতৃত্বের অধীনে আনতে হবে। কাও নিঃশব্দে সব শুনলেন। কিন্তু একটি কথাও বললেন না। আলোচনা শেষে পরদিন সকালেই আমি ডি পি ধরের সঙ্গে দেখা করে জানাই যে কাওয়ের মনোভাব নেতিবাচক। মনে হয় এ ধরনের বৈঠক তাঁর মনঃপূত নয়। তখন ডি পি ধর আমাকে ওই দিন অপরাহ্ণেই পি এন ধরের সঙ্গে দেখা করে একই অভিযোগ তুলে ধরার জন্য বললেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন পি এন ধর। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু এ বিষয়ে তিনিও কিছু বলতে পারলেন না, অথবা চাইলেন না। পরে কলকাতায় ফেরার আগে হয়তো আমার মুখে হতাশার ভাব দেখে একটু জোর দিয়েই ডি পি ধর বলেন, তাজউদ্দীন আহমদকে এই চাপ বজায় রাখতেই হবে, সমাধান একটা কিছু দাঁড়াবেই। আমার মনে হলো, মুজিব বাহিনীর পৃথক নেতৃত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্তটি ভারতের অত্যন্ত ক্ষমতাশালী আরও কোনো মহল অপরিবর্তিত রাখতে চায়। দিল্লিতে ঊর্ধ্বতন সরকারি ও রাজনৈতিক মহলের এসব খবর যাঁরা রাখতেন বা সংগ্রহ করতে পারতেন, এমন কিছু শুভার্থী—ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টা অশোক মিত্র, *মেইনস্ট্রিম* পত্রিকার সম্পাদক নিখিল চক্রবর্তী, *ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস*-এর পরিচালক কে সুব্রামনিয়ামের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনার পর এবং কলকাতায় অক্টোবরে মেজর জেনারেল বি এন সরকারের একাধিক সংক্ষিপ্ত অভিমত ও মন্তব্য থেকে আমার এ ধারণা ঘনীভূত হয় যে, মুজিব বাহিনী যাদের মাধ্যমে বা যে যুক্তিতে গঠিত হয়েছে, সেখানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজেরও এমন কিছু বাস্তব অসুবিধা আছে, যা সহসা পরিবর্তন হওয়ার মতো নয়।

আমি দিল্লি থেকে ফিরে আসার পরদিন সন্ধ্যায়ই ডি পি ধর কলকাতা এসে হাজির হন, যা ছিল অপ্রত্যাশিত। এর চেয়েও বেশি অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি আমাকে বললেন, খুব সম্ভব ১৭ সেপ্টেম্বর, তোমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি সম্মতি দেন, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) কর্মীদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এত দিন যে বাধা ছিল তা ভারত সরকার অপসারণ করবে। মাত্র সপ্তাহকাল আগে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা ওই দুই দলসহ পাঁচদলীয় 'জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করেছে, তারই ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার কাছে নতুন করে না গিয়ে ওই দিনই তাজউদ্দীন আহমদ একাই এ ব্যাপারে তাঁর সম্মতি জানান। ওসমানী কলকাতার বাইরে থাকায় বাংলাদেশ বাহিনীর উপপ্রধান এ কে খন্দকারের সঙ্গে তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আলাপ করেন। তাদের বাছাই ও অন্তর্ভুক্তকরণ করা শুরু হয়ে যায় দুদিন পরই। আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর প্রতিবন্ধকতার জন্য মুজিব বাহিনীকে বাংলাদেশ বাহিনীর নেতৃত্বের অধীনে আনা সম্ভব না হওয়ায় এর রাজনৈতিক ভারসাম্য বিধান করতেই ডি পি ধরের এই অসাধারণ ক্ষিপ্র উদ্যোগ। দুই বছর পর ডি পি ধর নিজেও তা স্বীকার করেন আমাকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে।

অবশ্য এর মাত্র সপ্তাহকাল বাদেই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মস্কো যাওয়ার কর্মসূচি ইতিমধ্যে স্থির হয়ে ছিল। সেখানেও হয়তো তাঁদের এমন কিছু অগ্রগতি দেখানোর প্রশ্ন ছিল যে মস্কোপন্থী বামদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সদ্ভাব ক্রমশ বেড়ে চলেছে বৃহত্তর জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতির দিকে। যদি পাকিস্তান চীনের সহায়তায় ভারতের বিরুদ্ধে সমরাভিযান শুরু করে, তাই তার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল আগস্ট মাসে। কিন্তু শরণার্থীদের চাপ ক্রমাগত বেড়ে চলায়, ভারত ক্রমশই বুঝতে পারছিল, এই বিশাল চাপ দীর্ঘদিন বয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই সেপ্টেম্বরে ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর জন্য পূর্ব বাংলা থেকে পাকিস্তানি সৈন্য সমূলে উৎখাতের জন্য তাদেরই হয়তো যুদ্ধ করতে হতে পারে। এ রকম সম্ভাবনার পক্ষে মস্কোর সম্মতি আদায় করাই ছিল সেপ্টেম্বরে ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সফর শুরুর সপ্তাহকাল আগে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে মস্কোপন্থী তরুণদের বিরুদ্ধে অনুসৃত নীতির পরিবর্তন ঘটে। এ ছাড়া কলকাতায় স্পষ্ট করেই ডি পি ধর আমাকে বলেন, মুজিব বাহিনী প্রশ্নের ফয়সালার জন্য তাঁর প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দরকার। তাঁর ভাষায়, ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রীর জন্যও অত্যন্ত নাজুক বা tricky, অর্থাৎ সমস্যা ছিল ইন্দিরা গান্ধী যেসব প্রশাসনিক কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করতেন, তার মধ্যেই। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধের পর আমেরিকার সিআইএ ভারতের ইনটেলিজেন্স ও

সিকিউরিটি সংস্থাগুলো পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেয়। এর পর থেকে যেসব ইনটেলিজেন্স সংস্থা গড়ে ওঠে, তার বেশ কটিই ১৯৭১ সালেও সক্রিয় ছিল। কাজেই অনুমান করতে অসুবিধা বোধ করিনি, কেন মুজিব বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ 'র'-এর হাত থেকে বের করে আনা এত নাজুক বিষয় হবে ইন্দিরা গান্ধীর জন্যও।

পরের ইতিহাস আমি অনেকটাই আমার বই *মূলধারা '৭১*-এ লিখেছি। আওয়ামী লীগের একাধিক উপদল সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে একযোগে তৎপর হয়ে ওঠে তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের জন্য। এই উদ্যোগের পেছনে সবচেয়ে সক্রিয় ও মরিয়া ছিল মুজিব বাহিনীর চার নেতার মধ্যে অন্তত দুজন। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে তাজউদ্দীনের প্রাণনাশের এক অসফল চেষ্টাও করা হয়।

সমস্ত সহ্যশক্তি নিঃশেষিত হওয়ার পর তাজউদ্দীন অক্টোবরের ২২ তারিখে দিল্লিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামের উপস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধীকে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, 'র'-এর সমর্থনপুষ্ট মুজিব বাহিনীর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করা আবশ্যক। সৈয়দ নজরুল অবশ্য কিছুই বলেননি। কারণ তাঁর দুই ছেলে তখন ছিলেন মুজিব বাহিনীর সদস্য। ইন্দিরা গান্ধী নিজেও তত দিনে বুঝে উঠেছেন যে 'র'-এর সৃষ্ট এই সমান্তরাল বাহিনী বাংলাদেশের গোটা নেতৃত্ব-কাঠামোকেই প্রায় অকার্যকর করে ফেলেছে এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রবাসী সরকারের নেতৃত্ব থেকে উৎখাত করার ব্যবস্থা করে মুক্তিযুদ্ধকে সম্যক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড় করিয়েছে। মস্কো সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত এই সভাতেই তিনি অবিলম্বে অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য ডি পি ধরকে নির্দেশ দেন। ডি পি ধর সেদিনই নির্দেশ দেন মেজর জেনারেল বি এন সরকারকে, যিনি নিযুক্ত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক দায়িত্বে, তিনি তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় জোনের 'ডিরেক্টর অপস (এফএফ)' হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এরপর মুজিব বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য বি এন সরকার উপর্যুপরি কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তখন নভেম্বর মাস, যুদ্ধের প্রস্তুতি সে সময় তুঙ্গে। এ অবস্থায় মুজিব বাহিনীর নেতাদের নিষ্ফল খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে ভারতীয় সামরিক অধিনায়ক জেনারেল মানেকশ নিজেই উদ্যোগ নেন তাঁদের অধিনায়ক মেজর জেনারেল এস এস উবানকে অন্য কাজে ডাইভার্ট করতে। উবানকে বলা হলো তাঁর তিব্বতি কমান্ডো বাহিনী 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স' (এসএফএফ) নিয়ে পাকিস্তান-সমর্থক মিজো সম্প্রদায়ের বাধা ডিঙিয়ে রাঙামাটি ও কাপ্তাই মুক্ত করতে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে তাঁর দ্বিতীয় বাহিনী 'মুজিব বাহিনী' থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। উবান গর্বের সঙ্গেই বলতেন, তিনি দু-দুটো কমান্ডো ফোর্সের অধিনায়ক, একটি তিব্বতি কমান্ডো বাহিনী, অন্যটি গেরিলা মুজিব বাহিনী!

স্যাম মানেকশর কৌশলী উদ্যোগ সত্ত্বেও কিন্তু দেখা গেল উবানকে মুজিব বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়নি। তাঁর তিব্বতি কমান্ডো বাহিনী যখন

রাঙামাটি মুক্ত করে, পিছু পিছু মুজিব বাহিনীও সেখানে হাজির হয়। এ ব্যাপারে উবান নিজেও তাঁর ভাষ্য দিয়েছেন। তাঁর লেখা বই *Phantoms of Chittagong—The 'Fifth Army in Bangladesh'* (বইটি প্রকাশ করেছ Allied Publishers Privet Limited, New Delhi, 1985) থেকে জানা যায়, তাদের পরিকল্পনা ছিল রাঙামাটি থেকে দ্রুত চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছানো। তারপর সেখান থেকে শেখ মণির নেতৃত্বে মুজিব বাহিনী লঞ্চযোগে দ্রুত ঢাকায় পৌঁছাবে এবং ভারতীয় বাহিনী স্থলপথে ঢাকা পৌঁছানোর পূর্বমুহূর্তে তারা ঢাকা করায়ত্ত করবে। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি ঘটে তাদের। উবান তাঁর দুই বিশেষ বাহিনী—তিব্বতি কমান্ডো ও মুজিব বাহিনী নিয়ে যখন চট্টগ্রাম শহরের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন একদিকে স্যাম মানেকশ তাঁকে বাহবা দিয়ে বার্তা পাঠাচ্ছেন, অন্যদিকে ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা তাঁকে জানাচ্ছেন, চট্টগ্রামে তোমাদের ঢোকার প্রয়োজন নেই। এক দিন পর চতুর্থ কোরের একটা ইউনিট গোলন্দাজ দলসহ সেখানে পৌঁছাবে, তারাই বরং পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করাবে। ফলে চট্টগ্রাম বন্দরও তাদের আয়ত্তের বাইরে থেকে গেল!

ত্রিশ বছর পর এটা বোধহয় পরিষ্কার করে বলা দরকার। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে প্রথমবারের বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যখন তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে গেছেন, মন্ত্রিসভা গঠন করে গেছেন, তখন স্বভাবসুলভ শান্ত গলায় ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তিনি ধরা দিলেন কেন? পরে পরিস্থিতি বুঝতে পারার পর ইন্দিরা গান্ধীই তাজউদ্দীন আহমদকে বলেন, 'আপনি এমনভাবে রাজনৈতিক উদ্যোগগুলো নিন, যাতে তা একটা সরকারে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। এবং তাহলেই আমরা আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারি।' বিভিন্ন দিকের চাপ ও নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী শেষ পর্যন্ত সেই কথা রেখেছিলেন।

এ কে খন্দকার : একটা বিষয় সম্পর্কে আমি পরিষ্কার নই, তা হলো ২৬ মার্চের পরপরই মুজিব বাহিনী গঠনকারীরা কীভাবে এত দ্রুত ভারত সরকার, মেজর জেনারেল উবান—ওঁদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারল। ওঁদের প্রভাবিত করতে পারল যে তারাই আওয়ামী লীগের বা শেখ মুজিবুর রহমানের মূল প্রতিনিধিত্বকারী।

মঈদুল হাসান : এর দুটি উপাদানের কথা আমি জানি, যা হয়তো আপনার জিজ্ঞাসার উত্তর কিছুটা দিতে পারে। একটা হচ্ছে, চিত্তরঞ্জন সুতার বরিশাল থেকে এমপিএ হয়েছিলেন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। তখন তিনি আওয়ামী লীগ করতেন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর তিনি ন্যাশনাল

আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ) যোগদান করেছিলেন। সম্ভবত ১৯৬৮ সালে শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। দুজনই তখন জেলখানায় বন্দী। তিনি শেখ মুজিবকে তখন বলেন, তাঁর সঙ্গে ভারতীয় উচ্চমহলের যোগাযোগ আছে, গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনও তাঁর চেনাজানা। তখন শেখ সাহেব বলেন, তুমি কলকাতায় যাবে, সেখানে থাকবে এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে। তারপর চিত্তরঞ্জন সুতার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ১৯৬৮ সালের দিকে আগরতলা চলে যান। এরপর তিনি চলে যান কলকাতায়। তিনি বেশির ভাগ সময় যোগাযোগ রাখতেন শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রীর সঙ্গে। বোধহয় এই সুবাদে চিত্তরঞ্জন সুতার ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা বিভাগ 'র'-এর ঘনিষ্ঠ একজন হয়ে ওঠেন। এই সব বিবরণ আমি চিত্তরঞ্জন সুতারের কাছেই শুনেছিলাম ১৯৮০ সালে। আমার বই লেখার তাগিদে মুজিব বাহিনী নিয়ে কিছু বিষয় পরিষ্কার হওয়ার জন্য ওই বছর গোড়ার দিকে দিল্লিতে আমি পি এন হাকসারের সহায়তা চাই। আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন 'র'-এর প্রধান আর এন কাওয়ের সঙ্গে। দুজনই তখন অবসরপ্রাপ্ত। কাও আমাকে বিশেষ কিছু বলেননি, কিন্তু ব্যবস্থা করে দেন উবানের সাক্ষাৎকার নেওয়ার। তিনিও তখন অবসরপ্রাপ্ত। উবান বরং অনেক তথ্যই দেন এবং কলকাতায় চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। চিত্তরঞ্জন সুতারের কাছে 'র' এর সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার এই বিবরণ আমি পাই।

১৯৭১-এর মার্চ মাসে পাকিস্তানি আক্রমণ শুরু হওয়ার মুখে শেখ মুজিব যুবনেতাদের চিত্তরঞ্জন সুতারের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। স্পষ্টতই একটা পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এটা ঠিক করা হয়েছিল, যার হয়তো কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে আরেকটা যে উপাদানের কথা আমি বলতে চলেছি তার মধ্য দিয়ে।

১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর শেখ সাহেব জেল থেকে বেরোন। ওই বছর অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ইয়াহিয়ার শাসনামলে তিনি চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান। ঠিক এমন সময় ইন্দিরা গান্ধীও লন্ডনে যান। সেই সময় ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন শেখ মুজিব। লন্ডনে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে শেখ সাহেবের দেখা হয় হামস্টেড হিথের একটা বাড়িতে। সেখানে ছিলেন আই সিং নামে এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক। আই সিং ছিলেন লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসের কাউন্সিলর। তিনি আসলে ছিলেন লন্ডনে 'র'-এর প্রধান। শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধীর বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন আই সিং নিজের বাড়িতেই। ১৯৭২ সালে আমি যখন লন্ডনে যাই, তখন আই সিং আমার সম্পর্কে জানতেন। হয়তো পি এন হাকসার বা ডি পি ধরের সুবাদে। ডি পি ধর তখন ভারতের পরিকল্পনামন্ত্রী এবং পি এন হাকসার প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। আই সিং

নিজেই একদিন এসে আমাকে তাঁর পরিচয় দেন। এবং তাঁকে কথা বলতে উৎসুকই দেখি। পুরোনো দিনের কথা প্রসঙ্গে আই সিং আমাকে জানান, সেই ১৯৬৯ সালের বৈঠকে তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন। কেননা এটা একটা সৌজন্য সাক্ষাৎ হিসেবেই শুরু হয়। সেই বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে আমরা জানি, নির্বাচনে আমরা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জিতব। কিন্তু ওরা আমাদের ক্ষমতা দেবে না। ঠিক ১৯৫৪ সালের মতো হবে। আবার কেন্দ্রীয় শাসন জারি করবে। ধরপাকড় করবে। শেখ সাহেব আরও বলেন, 'কিন্তু এবার আমি তা হতে দেব না। আমার কিছু ছেলেকে তোমাদের অস্ত্রপ্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর একটা বেতারযন্ত্র দিতে হবে, যেখান থেকে তারা যাতে প্রচার করতে পারে যে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।' আই সিংয়ের এই তথ্য আমি বিশ্বাসযোগ্য মনে করি, কেননা হুবহু একই ধরনের গেম-প্ল্যানের কথা আমি শুনিছিলাম ১৯৬২ সালে, যখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আই সিংয়ের ভাষ্য মোতাবেক ইন্দিরা গান্ধী সহানুভূতির সঙ্গেই শেখ মুজিবকে আশ্বাস দেন যে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করব। ঘটনা ঘটুক, দেখা যাক। এ সময় মিসেস গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বটে, তবে মোরারজি দেশাইয়ের সিন্ডিকেটের সঙ্গে তাঁর ক্ষমতার লড়াইয়ের ফলাফল তখন অনিশ্চিত। তাঁকে একটা নির্বাচন মোকাবিলা করতে হবে ১৯৭১ সালের শুরুতে। এই নির্বাচন ছিল ইন্দিরা গান্ধীর জন্য মরা-বাঁচার লড়াই। সে বছর মার্চ মাসের মাঝামাঝি সে নির্বাচন হয়। তাতে তিনি জয়যুক্ত হন।

এই দুটো উপাদান ছাড়াও আরও নিশ্চয় অনেক যোগাযোগ ছিল, ঘটনা ছিল। ঘটনার জটিল ডালপালাও ছিল।* ফলে পাকিস্তানিরা ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যুবনেতারা কলকাতায় 'র'-এর সহায়তায় সমস্ত সুবিধা পেলেন এবং অক্টোবরের শেষ অবধি তা পেতে থাকলেন। এখনো এই বিষয়গুলো অজ্ঞাত ও অনুদ্‌ঘাটিত।

*** ডালপালার কথা :** সংযোজন (২০০৯)

সাম্প্রতিক কালে আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট কর্তৃক অবমুক্ত সরকারি নথিপত্রের মধ্যে রয়েছে ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক কার্যনির্বাহী সভার 'মেমোরেন্ডাম ফর রেকর্ডস'। ওই সভায় বলা হয়, মার্কা ও উৎসের ছাপ নেই এমন সব হালকা অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য ভারত থেকে একটা অনুরোধ সিআইএর কাছে এসেছে। ভারতের কোন মহল থেকে এই অনুরোধ করা হয়েছে তা গোপন রেখে বলা হয়, ভারতে সিআইএর এমন 'বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম' আছে, যারা 'পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযোদ্ধাদের' এই অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে পারে। সেই দলিলের একাংশের ফটোকপি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

24. Memorandum for the Record[1]

Washington, April 9, 1971.

SUBJECT

40 Committee Meeting—April 9

PARTICIPANTS

Henry A. Kissinger, Assistant to the President
John Irwin, Under Secretary of State
Thomas Moorer, Chairman, Joint Chiefs of Staff
Robert Cushman, Deputy Director of Central Intelligence
Warren Nutter, Assistant Secretary of Defense
Joseph Sisco, Assistant Secretary of State
David Blee, CIA
Harold H. Saunders, NSC Staff

Following a Senior Review Group meeting on Ceylon and Pakistan,[2] the meeting moved into executive session at the request of the CIA member in order to consider an item appropriate to the 40 Committee.

General Cushman began by summarizing a request that had been received [*less than 1 line of source text not declassified*] which had been circulated in a short memo before the meeting (attached).[3] This was a request for CIA provision of unmarked small arms [*less than 1 line of source text not declassified*] to provide to the "freedom fighters" in East Pakistan. General Cushman remarked that the Agency had a secure channel through which it could deliver such weapons but that his personal opinion was that this operation would not remain secret much beyond that. He noted that Director Helms did not favor the project.

In response to Dr. Kissinger's query, the following views were expressed:

—Mr. Irwin was "reluctant."

—Admiral Moorer felt that it would be "very wrong" to be working on both sides of the East Pakistani issue at once.

—General Cushman felt that an affirmative response would pre-judge the larger policy issue which the Senior Review Group had been discussing.

—Dr. Kissinger summarized by saying that he felt the President would never approve this project.

---

1 Source: National Security Council Files, 40 Committee, Minutes—1971, Secret; Sensitive.

2 See Document 23.

3 An April 9 memorandum from Helms to Kissinger was attached but not printed.

সিআইএর মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহের সেই প্রস্তাব ওই সভায় যে বেশি দূর এগোতে পারেনি, তা স্পষ্ট। কিন্তু ৯ এপ্রিল যাদের অস্ত্র দেওয়ার কথা উঠেছিল, সেই 'পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযোদ্ধারা' কারা? কারণ তখনো মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কোনো ঘোষণা হয়নি। এই মর্মে ১১ এপ্রিল প্রথম বেতার ঘোষণা দেন তাজউদ্দীন আহমদ। বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল। পরবর্তীকালে সিআইএর তৈরি চাকরাতা ঘাঁটি, মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা যারা ব্যবহার করে, তাদের সঙ্গে পূর্ববর্তী উদ্যোগের আদৌ কোনো সম্পর্ক ছিল কি না তা অস্পষ্ট।

আরও পরে, ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে আমেরিকা যখন তাদের ক্ষয়ক্ষতি সীমিত করার কাজে উদ্যোগী হয়, তখন পাকিস্তানকে নিঃশর্তভাবেই শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে হয়। শেখ মুজিব দেশে ফিরেই এক নতুন নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করার প্রয়োজন বোধ করেন এবং মুজিব বাহিনীর কেবল অনুগত অংশ নিয়ে জাতীয় রক্ষী বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। মুক্তিযুদ্ধকালের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা না করেই একক উদ্যোগে তিনি যাকে ডেকে এনে রক্ষী বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব দেন, তিনি সেই ষাটের দশকের সিআইএর রিক্রুট এবং হাল আমলে 'র'-এর স্পেশাল ফোর্সের আইজি মেজর জেনারেল এস এস উবান!

—মঈদুল হাসান

স্বাধীনতার পরবর্তী প্রসঙ্গ

মঈদুল হাসান: স্বাধীনতার পর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কয়েকজন কর্মকর্তাকে কলকাতা থেকে ঢাকায় পাঠায়। সে দলে আপনি (এস আর মীর্জা) ছিলেন।

এস আর মীর্জা: ১৮ ডিসেম্বর বিকেলে আমরা ঢাকা পৌঁছাই হেলিকপ্টারযোগে। আমাদের পূর্বাণী হোটেলে রাখা হয়। পরদিন সিভিল এভিয়েশন অফিসে গেলাম। দেখলাম, বাঙালি যাঁরা সিনিয়র অফিসার ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগ পাকিস্তানে। তাঁরা মোট আটজন ছিলেন। অন্যদিকে যাঁরা বাংলাদেশে আছেন, তাঁরা সব জুনিয়র অফিসার। ঢাকার এয়ার ফিল্ড অকেজো। বোমা ফেলে নষ্ট করা হয়েছিল বাই ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স টু প্রিভেন্ট সেভেনথ ফ্লিট অ্যান্ড চায়না সোলজার, যাতে তারা এই এয়ারপোর্ট ব্যবহার করতে না পারেন, সে জন্য সম্পূর্ণ অকেজো করে দেওয়া হয়েছিল। বিরাট বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। আমার মনে আছে, ১৯টি বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। সেভেন ফ্লিট থেকে বিমান এসে যেন এখানে না নামতে পারে সেটার প্রতি লক্ষ রেখেই বেশি বোমা ফেলা হয়েছিল, যাতে কোনোভাবেই এই এয়ারপোর্ট ব্যবহার করতে না পারে তারা। ঢাকায় এসে আমার দায়িত্ব হলো আগে এয়ার ফিল্ড সচল করা।

যা-ই হোক, সিভিল এভিয়েশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। যে আটজন সিনিয়র অফিসার পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন তাঁরা পরে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তখন আমি ওসমানীকে বলি, তাঁদের মধ্যে যে সবার সিনিয়র—গুলজার হোসেন, তিনিই আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবেন। কারণ আপনি জানেন যে বহু আগেই আমি পাকিস্তান এয়ারফোর্স থেকে অবসর নিয়েছি এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমাকে কেউ বলেননি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে।

কিন্তু আমার সুপারিশ সত্ত্বেও কর্নেল ওসমানী সিনিয়র অফিসার গুলজার হোসেনকে দায়িত্ব দেননি, যিনি সিভিল এভিয়েশনের নিজস্ব অফিসার ছিলেন। ওসমানী বিমানবাহিনী থেকে একজন অফিসারকে নিয়ে এসে এখানে বসালেন। এ ঘটনায় গুলজার হোসেন খুবই ব্যথিত হন। তারপর তিনি পদত্যাগ করে চলে গেলেন এবং আইজিওতে ভালো বেতনের চাকরি পেলেন। এগুলো আসলে পার্ট অব আওয়ার ম্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আর্মিতেও এখনো তা-ই চলছে। জেনারেল এরশাদের আমলে ব্রিগেডিয়ার এনামকে দিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে সিদ্ধান্ত বদলে বলা হয় যে সিভিল এভিয়েশনে এবং বিমানের প্রধান উইল অলওয়েজ বি ফ্রম এয়ারফোর্স। যেটা আমি মনে করি, এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত। সিভিল অরগানাইজেশন চালাবে সিভিল অফিসার। হোয়াই আর্মি? এগুলো তো পাকিস্তানিদের করা। স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানি কাঠামোই অনুসরণ করলাম। এ সম্পর্কে এ কে খন্দকার ভালো বলতে পারবেন।

মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের বিরাট শক্তি ছিলেন। তাঁদের এই সরকার একদম ভুলে গেল। তাঁদের জন্য কিছু করা হলো না বা তাঁদের নিয়ে কিছু করা হলো না। তাঁদের বাড়ি চলে যেতে বলা হলো। অথচ উচিত ছিল সবার একটা তালিকা তৈরি করে মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তুলে তাঁদের দেশ গড়ার নানামুখী কাজে লাগানো। তা না করে নেতারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কে কোন ফ্যাক্টরি পাবেন, বাড়ি পাবেন তা নিয়ে। তাঁরা সমাজতন্ত্র করবেন বললেন, সেটাও তো সম্পূর্ণ ফেল করল।

আরেকটি বিষয়ে বলব, পাকিস্তানি যে শাসনব্যবস্থা, যে কাঠামো, স্বাধীনতার পরও সেই কাঠামো, সেই প্রশাসনব্যবস্থা রেখেই তারা কাজ শুরু করলেন। একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী শাসনব্যবস্থা, যা মানুষের প্রত্যাশা ছিল, সেটি তারা করলেন না।

আপনারা শুনেছেন, ব্যাপক আলোচিত, বহুল উচ্চারিত সিক্সটিনথ ডিভিশনের কথা। যুদ্ধের পরপরই কর্নেল ওসমানীর স্বাক্ষরে হাজার হাজার সার্টিফিকেট দেওয়া হলো, যাঁরা কোনো দিন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। তাঁদেরই ওই বাহিনী নামে অভিহিত করল এ দেশের মানুষ। সিক্সটিনথ ডিভিশন, অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরে তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা হলেন।

এছাড়া স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ব্যবস্থার অধীনে আনা হলো না। ফলে তার যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া হলো, সেটা তো আপনি আজও দেখতে পারছেন। সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। বিশৃঙ্খলা এসে গেল। যে স্পিরিট নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিলাম, সেই স্পিরিটটা কীভাবে আস্তে আস্তে ধ্বংস করা যায়, সেই চেষ্টা চলতে লাগল। এ জন্য অনেক ঘটনা কাজ করেছিল। বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে প্রায় সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। আর দালাল আইন যেটা করা হয়েছিল, তাতেও ছিল অনেক ফাঁকফোকর। এই ফাঁকফোকরের ভেতর

দিয়ে অনেক হত্যাকারী, নারী নির্যাতনকারী জেল থেকে বেরিয়ে এল। যারা প্রকৃত কালপ্রিট, যারা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করল, তাদের তো কোনো বিচার হলো না। এভাবে কম্বিনেশন অব অল দিস ফ্যাক্টরস কাজ করায় স্বাধীনতার পর যে সুন্দর বাংলাদেশের কল্পনা আমরা করেছিলাম, যেখানে সবাই সুখে থাকবে, কেউ না খেতে পেয়ে মারা যাবে না, গরিব থাকবে না, সম্পদের সুষম বন্টন হবে—এসবের কিছুই হলো না।

এ কে খন্দকার: স্বাধীনতার পরপরই সিক্সটিনথ ডিভিশনের দেখা আমিও পেয়েছিলাম। তখন যে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক, সেই ব্যাংকের টাকা পোড়ানো হয়েছিল, সেখানেও লুটপাট হয়। তখন থেকে যে লুটপাট শুরু হলো, সেই ধারা আজও চলছে। বেশ কিছু তরুণ বলতে গেলে ১৬ ডিসেম্বর থেকেই লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে সময় যাঁরা দেশে ছিলেন এবং দেশের বাইরে থেকে দেশে এলেন, তাঁরা সবাই এটা অনুভব করেছেন। এমনকি ১৬ ডিসেম্বর যখন, তখনকার পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক, পরে যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক হলো, সেখানে যে নোট পোড়ানো হয়েছিল, সেই নোট লুটপাটে বেশ কিছু তরুণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অংশ নিয়েছিল। যারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লুটপাটে অংশ নিল এবং যারা পরে মানুষের ওপর অত্যাচার শুরু করল, ব্যক্তিগত যে শত্রুতা ছিল, সেই শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে শুরু করল। এরা কারা এ বিষয়ে কিন্তু কোনো দিনই সরকারিভাবে ইনকোয়ারি বা কোনো কিছু করা হয়নি। এসব অপকর্মের মধ্যে যারা ছিল, তাদের অনেকেই হয়তো যারা আগে অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে দেশের ভেতর ঢুকেছিল, কিন্তু যুদ্ধ করেনি, তাদের একটা বড় অংশ ছিল এবং দেশের ভেতরে যারা রাজাকার ও শান্তি কমিটির হয়ে কাজ করেছিল, তাদেরও একটা অংশ ছিল। এ ছাড়া পরে যারা অস্ত্র নিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্য থেকেও কিছু থাকতে পারে। এটা কোনো বিশেষ গ্রুপ থেকে যে এসেছে তা নয়, দুষ্কৃতকারী সব প্রতিষ্ঠানেই থাকে। সবাই মিলে এগুলো করেছে।

এর ফলে কিন্তু মুক্তিবাহিনীর নামে অযথা ব্যাপক দুর্নাম রটে যায়। দেশবাসী বলা শুরু করল যে এরা আসলে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেনি, এরা দেশে লুটপাট করতে এসেছে। প্রকৃত অর্থে যারা দেশ স্বাধীন করার জন্য লড়াই করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু এসব লুটপাটে অংশ নেননি। বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু খারাপ, যারা অসামাজিক লোক, দুষ্কৃতকারী, তারা একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় লুটপাট করতে আরম্ভ করল। তাদের লুটপাটের কারণে কিন্তু বাংলাদেশে একদম প্রথম থেকে এমন অরাজকতা সৃষ্টি হলো যে লুটপাট শুরু হলো, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা জাগল, তা অব্যাহত গতিতে চলল এবং সেটা আজও অব্যাহত। এ অবস্থার অবসানে কোনো সরকারই চেষ্টা করেনি। আমি বিশেষভাবে অনুভব করি, এর ফলে বিনা কারণে মুক্তিযোদ্ধারা দুর্নামের শিকার হলেন। সুকৌশলে রটনা করা হলো যে মুক্তিযোদ্ধারাই এসব দুষ্কর্মের জন্য দায়ী। এই যে

লুটপাট, যা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ব্যাপকভাবে শুরু হলো, তাদের সবাই 'সিক্সটিনথ ডিভিশন' নামে অভিহিত করল। তবে এর যে প্রভাব বা ফল আজকের মতো এতটা ভয়াবহ ও এতটা খারাপ হবে, সেটা কিন্তু তখনকার মানুষ চিন্তা করেনি। কোনো সরকারও কিন্তু বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখেনি।

এই যে সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু হলো স্বাধীনতার উষালগ্নে, সেই কর্মকাণ্ড বন্ধে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। সত্যিকার অর্থে সরকার তাদের কোনো বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি, কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। যার ফলে এর কুফল আজ পর্যন্ত আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি। এটা কিন্তু কোনো দিনই বন্ধ হয়নি।

মঈদুল হাসান : এর সঙ্গে দু-একটি কথা আমি যোগ করতে চাই। প্রথমত, স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর, অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের পর এখানে প্রশাসনিক কাঠামো বলতে কিছুই ছিল না। সবে কিছু দায়িত্বশীল লোক কলকাতা থেকে এসেছেন, তাঁরা প্রশাসন আবার কীভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। এখানে না ছিল পুলিশ, না ছিল প্রশাসন। এর মধ্যে এই সুবিধাবাদী কিছু লোক, তাদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু উপাদান যে ছিল না তা নয়, কিন্তু এর সঙ্গে আরও অনেকে ছিল। এই ঢাকা শহরেরই বহু ওয়েল-টু-ডু ফ্যামিলির যুবক, যারা কখনোই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল না, মুক্তিযুদ্ধে যায়নি বা দেশত্যাগ করেনি, তারা এই সুযোগে লুটপাট শুরু করে।

লুটপাটের প্রসঙ্গে একটা সাধারণ প্রবণতার কথা আমি বলতে চাই। এখানে এই প্রবণতা আমরা বরাবর দেখেছি। যেমন, পাকিস্তানিরা যখন এখানে রাজাকার বাহিনী করে, তখন এই রাজাকার বাহিনীকে কিন্তু বেতন দেওয়া হতো, ভাতা দেওয়া হতো, তার পরও তারা যখন অপারেশনে যেত, তখন তারা লুটপাট করত। এটাও দেখেছি যে ২৫ মার্চ অপারেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানের পেশাদার সেনাবাহিনীর কোনো কোনো ইউনিট লুটপাটের কাজে নেমে পড়ে। তারা সিসটেমেটিক্যালি মূল্যবান জিনিসপত্র, যেগুলো মানুষের বাড়িতে পেত, বিশেষ করে সোনা, নগদ অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস, সেগুলো লুট করে নিয়ে যেত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন লুটপাটে অংশ নিতে শুরু করে, তখন থেকেই তাদের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়, তাদের সংগঠনের শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করে।

এ প্রসঙ্গে তার আগের ঘটনাও বলা দরকার। ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন, তখন ঢাকায় মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে—প্রতিবাদে, মিছিলে, স্লোগানে মুখর করে তোলে ঢাকার রাজপথ। এই উত্তেজনার আরও এক প্রকাশ আমরা দেখলাম, যখন ২ মার্চ থেকে লুটপাট শুরু হয়ে গেল। তখন যেটা ছিল জিন্নাহ এভিনিউ, এখন যেটা বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, সেখানে বড় দোকান, যেগুলো ছিল অবাঙালিদের, যেমন গ্যানিস, এসব দোকান সাধারণ লোকজন, যুবক, রিকশাওয়ালা, মজুর, অফিস-কর্মচারীরা লুটপাট শুরু

করে। তখন এসব থামাতে রাজনৈতিক নেতাদের বিবৃতি দিতে হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে জানালেন, লুটপাট বন্ধ করতে হবে।

তার পরও এই লুটপাটের অন্য রকম প্রকাশ দেখি, যখন এই আন্দোলনটা বেশ বড় আকার নিল, বিশেষ করে ৭ মার্চের পর। তখন হিড়িকের সঙ্গে এ দেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা চলে যেতে শুরু করেন। বিশেষ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, যাদের টাকা-পয়সা ছিল। এর আগে এ কে খন্দকার সাহেব উল্লেখ করেছেন যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ফার্মগেটের কাছে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে তাদের কাছ থেকে টোল আদায় করা হতো, মুক্তিপণ আদায় করা হতো। এমনকি কেড়ে নেওয়া হতো অবাঙালি পরিবারের কাছ থেকে সোনার গয়নাপত্র।

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে সংঘটিত এসব ঘটনা যারা ম্যানেজ করেছে, তারা কিন্তু অজ্ঞাতনামা কোনো মানুষ ছিল না বা সাধারণ দুষ্কৃতকারীও ছিল না। এরা অনেকেই ছিল স্থানীয় ছাত্রলীগেরই পরিচিত নেতা-কর্মী। এরাই এসব কাজ করেছে। আরও অবাক করা কাণ্ড, পাকিস্তানি আক্রমণ শুরু হওয়ার পর যখন অত্যাচারিত মানুষ ভারতের উদ্দেশে রওনা হতো, আমাদের কাছে খবর আসত যে সীমান্তে তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সোনাদানা থাকলে সেগুলোও কেড়ে নেওয়া হতো। কারা এসব করত? সত্যি বলতে, এরা প্রধানত ডাকাত ও দুষ্কৃতকারী। আবার কিছু বিদ্রোহীও এ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে এমন খবরও পাওয়া গেছে যে এই লুটপাটের সঙ্গে এক সেক্টর অধিনায়ক পর্যন্ত জড়িত ছিলেন। এ বিষয়ে এ কে খন্দকার হয়তো বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে আরও বলতে হয়, পাকিস্তানের বর্বরোচিত আক্রমণ এবং সংঘটিত বিদ্রোহের ফলে সমাজের আইন, প্রশাসন যখন ভেঙে পড়ে, তখন কিন্তু এসব ল'লেস উপাদানগুলো বেরিয়ে পড়তে শুরু করে। এগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি বিপ্লবের আমল থেকেই ঘটে আসছে। সমাজের নৈতিক ও প্রশাসনিক ভিত্তি ভেঙে পড়ার পর অরাজকতার শক্তি অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে, আন্দোলনের নেতৃত্ব পদেও তারা স্থান পায়। ২৫ মার্চের ধ্বংসযজ্ঞের পর যে কতক সরকারি ট্রেজারি ও ব্যাংক লুট করা হলো, সেই লুটের টাকার সম্ভবত বড় অংশই প্রবাসী সরকারের কোষাগারে জমা হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছিলেন কেউ কেউ। লুটের টাকার ভাগীদার যাঁরা কলকাতায় এসে উঠেছিলেন, তাঁদের জীবনযাত্রা ও প্রভাব দুটোই যথেষ্ট ছিল। এঁরা সংখ্যায় অবশ্য কম ছিলেন। পাশাপাশি বেশির ভাগ মানুষই চেষ্টা করেছে কেবল বেঁচে থাকার জন্য, আর অধিকাংশ তরুণ দেশ থেকে পাকিস্তানিদের তাড়াতে হবে এই সংকল্প নিয়ে আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। কিন্তু যা হয় সমাজে, অল্পসংখ্যক দুষ্কৃতকারী বিশাল জনসমষ্টির মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে এবং সমাজের মূল্যবোধ তছনছ করে ফেলে।

আমার আরও মনে হয়, অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে, মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী যাত্রায় পুরোনো সমাজের শাসনকাঠামোই কেবল নয়, সমাজের মূল্যবোধের কাঠামোও ভেঙে পড়ে, যা আমরা কখনোই দেখার ও পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করিনি। তার আগে কেউ কখনো ভাবত না যে সে একটা বন্দুক নিয়ে বা কোনো জায়গায় অপারেশন চালিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের কাজেই হোক অথবা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে, টাকা লুট করা যেতে পারে। আগে তাদের মনে যে একটা মানসিক বাধা ছিল, অস্ত্র নিয়ে এমন কাজ করা উচিত নয়, এটা শেষ হয়ে যায়। কাজেই অস্ত্র দেখিয়ে লুট, ভয় দেখিয়ে লুট—এটা এই সমাজের মাঝখানে এসে গেল।

আমার মনে হয়, সমাজের ওপর মুক্তিযুদ্ধের এই দীর্ঘমেয়াদি ইমপ্যাক্টের অ্যাসেসমেন্টটা আমরা কখনো করে দেখার চেষ্টা করিনি, প্রতিবিধানের কোনো ব্যবস্থা নিইনি। আমরা শুধু বলে এসেছি, সন্ত্রাসীদের রুখতে হবে, কালো টাকা ও সন্ত্রাসী মাসল-পাওয়ারের জন্য সমাজ ও রাজনীতি খারাপ হয়ে পড়েছে। এর শেকড় কিন্তু গড়ে ওঠে ওই মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে; যখন সমাজ ভেঙে পড়েছিল, বেসামরিক শাসনকাঠামো ভেঙে পড়েছিল, মূল্যবোধের কাঠামো ভেঙে পড়েছিল।

কিন্তু সেটা কমানো যেত। সে রকম একটা উদ্যোগ বিজয়ের ঠিক পরপরই নেওয়া হয়েছিল দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ রেখে এবং সমন্বিত পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু তা বহাল ছিল স্বল্পকালের জন্য। ১০ জানুয়ারি যখন শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে এলেন, তখন সেই সব উদ্যোগ বাদ দিয়ে তাঁর পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রাষ্ট্রের অ্যাপারেটাসকে নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিয়োগ করা হলো। কাজেই তাঁরা এই সার্বিক বিশৃঙ্খলা কমানোর ব্যাপারে বিশেষ এগোতে পারলেন না।

তাঁরা কেন পারলেন না? কারণ একটা বিরাট সামাজিক বিপ্লবের পর কীভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করতে হয় তা তাঁরা জানতেন না। মুক্তিযুদ্ধের তেমন অভিজ্ঞতা না থাকায় সমাজে ও মানুষের মনে যে কত বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে তা শেখ মুজিবের জানার কথা ছিল না। তাছাড়া পুরানো বা নতুন কোনো আইনই কার্যকর করা যায় না, যদি সেটাকে পক্ষপাতমূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। আইন প্রয়োগ করতে হয় যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে, পক্ষপাতশূন্যতা বা নিরপেক্ষতার ওপর ভিত্তি করে। তখন এমন হতো যে দুষ্কৃতকারীকে ধরলেই বলা হতো, ও আমাদের লোক, ও আমাদের ছাত্রলীগের লোক, ও আমাদের দল করত, আমাদের ভোট দিয়েছে—এসব বিবেচনায় দুষ্কৃতকারীদের ছেড়ে দেওয়া হতো। ফলে আইন হয়ে পড়েছিল দুর্বল। আরও একটা বড় কথা, মূল্যবোধের কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হলে কিন্তু গোটা নেতৃত্বকেই সেই মূল্যবোধের অধিকারী হতে হতো, দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হতো।

যাঁরা ক্ষমতায় এলেন, তাঁরা যে একটা ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বা সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ শেয়ার করছেন, এটা কিন্তু খুব একটা তখন দেখা

যায়নি। বরং তাদের নতুন অধিগ্রহণ করা বাড়ি, গাড়ি, ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়াস, একটু পারিবারিক আনন্দ, বিয়ের ধুমধাম ইত্যাদি এমন একটা যুদ্ধবিপর্যস্ত সমাজের সঙ্গে বেমানান ছিল। একটা সময় দেশে দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করছিল। অনাহারে মানুষ মারা যাচ্ছিল।

এখানে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে পরিষ্কার করতে চাই। ১৯১৮-১৯ সালের ঘটনা, আমি ইতিহাসকারদের বর্ণনা থেকেই বলছি। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ধর্মঘটী রেলশ্রমিকেরা বিদ্রোহী হয়ে ক্রেমলিনে ঢুকে যায়। তখন দুপুর। তাঁদের প্রতিনিধিদের যেতে দেওয়া হলো লেনিনের কাছে। তাঁরা তাঁকে বলেন, 'আমরা খুব কষ্টে আছি, এক বেলা করে খাই এবং আমরা লাঞ্চ করি এক টুকরো পাউরুটির সঙ্গে এক টুকরো পেঁয়াজ দিয়ে। আর তোমরা বিপ্লবের নামে এখানে এত বড় বড় বাড়িতে বসে সরকার চালাচ্ছ!' লেনিন তাঁদের সব কথা শুনলেন, বুঝলেন তাঁদের অভিযোগ। তিনি বললেন, 'কমরেড, এখন তো দুপুরের খাওয়ার সময়, কিন্তু আমার কাছে তো বেশি নেই, আমি একজন বা দুজনের সঙ্গে আমার লাঞ্চ শেয়ার করতে পারি।' এ কথা বলে তিনি তাঁর টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে লাঞ্চ-বক্সটা বের করে শ্রমিক নেতাদের সামনে মেলে ধরলেন। লেনিনের লাঞ্চ প্যাকেটেও দেখা গেল যে এক টুকরো পাউরুটি আর একটা পেঁয়াজ।

নেতৃত্বের এই যে মানবিক উপাদান, এগুলো কিন্তু নির্যাতিত, অভাবি ও অধিকারসচেতন মানুষের মধ্যে বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে। মানুষ এগুলো গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারাটাই ছিল অন্য ধরনের—তাঁর কথার বরখেলাপ যেন কেউ না করে, তাঁর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বে সবাই যেন ভয় পায়—এদিকেই ছিল তাঁদের সর্বক্ষণের তীক্ষ্ণ নজর। রাজনৈতিক নেতৃত্বটাই ছিল নিজেদের অনুগত লোকদের দিয়ে গুণগান, 'বিশ্বে এল নতুন বাদ' জাতীয় নির্জলা তোষামোদ দিয়ে ব্যক্তিবন্দনা করা, গালভরা খেতাব দিয়ে তাঁকে অতিমানবে পরিণত করানো—দৃষ্টান্ত নয়, শুধু প্রচার; যাতে মুক্তিযুদ্ধে অনুপস্থিতির প্রশ্নটা না ওঠে।

শুধু তা-ই নয়, এই নেতৃত্বের স্থায়িত্ব রক্ষায় টাকা সংগ্রহের জন্য যেসব ভ্রান্তপথের অনুসরণ করা হয়, তা নৈতিকতার মানের আরও অধঃপতন ঘটায়, অরাজকতার শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের আগে এটা যেন নেতৃত্বের অনেকেরই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা বলতেন—আমাদের টাকার দরকার, নির্বাচন করতে হবে।

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা বলব, জানি না এটা সমীচীন হবে কি না। তবে এটা লিপিবদ্ধ রাখতে চাই। আমি বাংলাদেশ থেকে বিদেশে চলে যাই ১৯৭২ সালের মে মাসে। সে সময় পি এন হাকসার বাংলাদেশের দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে সেই দায়িত্বে ছিলেন ডি পি ধর। ফেব্রুয়ারি মাসের

প্রথম দিকেই শেখ মুজিবুর রহমানের জোরালো দাবির কারণে ডি পি ধরকে বাংলাদেশের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সে আরেক কাহিনী।

যা-ই হোক, পি এন হাকসার ভেবেছিলেন, নিশ্চয় ডি পি ধর এমন কিছু ভুল করেছেন, যার জন্য তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি করা হয়েছে। তারপর ঢাকায় আসেন পি এন হাকসার। ঢাকায় এসে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনার পর হাকসার বলেন যে বাংলাদেশ সরকারের বেশ কয়েক কোটি টাকা—যতদূর মনে পড়ে ১৭ কোটি টাকা—রয়েছে ভারতে। যে টাকাটা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই টাকা বদলানো হয়েছিল ভারতীয় মুদ্রায়। সেই টাকা প্রবাসী সরকার কিছু খরচ করেছে, অবশিষ্ট টাকা রয়েছে ভারতীয় ব্যাংকে। তিনি তাঁকে বলেন, 'ভারত সরকার এই টাকাটা ফেরত দিতে চায়। কিন্তু কীভাবে আমরা ফেরত পাঠাব। ব্যাংক ড্রাফট করে পাঠাব, নাকি তোমরা জিনিসপত্র কিনবে—জিনিসপত্র কিনলে তার বিপরীতে ব্লক হিসাবে আমরা সেই টাকা দেব? তবে আমরা বৈদেশিক মুদ্রায় দিতে পারব না, ভারতীয় মুদ্রায় দেব।' তখন শেখ মুজিব বললেন টাকাগুলো ট্রাকে করে পাঠিয়ে দিতে। বিস্মিত পি এন হাকসার শেখ মুজিবকে বললেন, 'ট্রাকে করে টাকা কীভাবে দেব? আমাদের তো সরকারি হিসাব-পদ্ধতি আছে, ব্যাংকিং পদ্ধতি আছে।' তারপর নাকি শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'সামনে আমার নির্বাচন, এই টাকা সে জন্য আমার দরকার হবে।' পি এন হাকসার অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক, ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের ওই কথায় তিনি খুবই আহত হয়েছিলেন। পরে হাকসার ভারতে ফিরে গিয়ে মিসেস গান্ধী ও সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের এ কথা বলেন। ডি পি ধর, যিনি তখন ভারতের পরিকল্পনামন্ত্রী—আমাকে ১৯৭২ সালের জুন মাসে এই খবরটা দেন। ১৯৮১ সালে হাকসার নিজেও আমার কাছে এই ঘটনাটা নিশ্চিত করেন। ঘটনাটা হয়তো ছোট কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহলে যেখানে তাঁর উঁচু শ্রদ্ধার আসন ছিল, সেখানে সুনাম রক্ষার ক্ষেত্রে তা তত ছোট ছিল না। আর তা যদি হতো, তবে এই খবর আমার কাছে পৌঁছাত না।

এ রকমই ধারণা ছিল আমাদের নেতাদের। আমি কারও বদনাম করার জন্য বলছি না। কিন্তু কিছু ভুল ধারণার মানুষই ক্ষমতার খুব বড় বড় পদে বসেছিলেন। ফলে, নানাভাবে অনিয়ম ও অরাজকতা আমাদের এখানে আরও বিস্তৃত হয়েছে। এ-জাতীয় কাজ হতে হতে যেটা হয়েছে—যে লোকের কাছে চোরাচালানের টাকা, ঘুষ খাওয়ার টাকা, রিলিফের সামগ্রী বিক্রির টাকা, ব্যাংক থেকে সরানো টাকা, সরকারের বাজেটের স্কিম থেকে অন্যায়ভাবে সরানো টাকা—এসব টাকা নিয়ে তাঁরাই নিজেদের রাজনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করেন, কর্মী সৃষ্টি করেন টাকা দিয়ে। রাজনৈতিক দলগুলো তাঁদেরই মনোনয়ন দেয়। আমি সব দল সম্পর্কেই বলছি। এ কথা সব দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জিয়াউর রহমান এবং এরশাদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

দেশে এখন কালো টাকা, দুষ্কৃতকারী এবং রাজনীতির এই সংস্কৃতিরই চল হয়ে গেছে। ফলে আজকে দেশে শাসনব্যবস্থায় যে প্রচণ্ড সংকট দেখা দিয়েছে, তার ধারাবাহিকতা আমি দেখি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সমাজটা যেভাবে আলোড়িত হয়েছিল, সেই আলোড়িত সমাজকে আবার পুনর্বিন্যস্ত করা, আবার তাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যে নীতি ও নৈতিকতাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের দরকার ছিল, তা বহুলাংশেই স্বাধীনতার প্রথম ২০ বছরে আমি দেখিনি। হয়তো জিয়াউর রহমানের আমলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি অবস্থা বাহ্যত কিছুটা কমে এসেছিল; কিন্তু টাকা দিয়ে মানুষকে বশ করা—এই অনুশীলনটা তাঁর সময়ে জোরেশোরে শুরু হয়েছিল। খামে করেও টাকা দেওয়া হতো বিভিন্নজনের কাছে, রাজনীতিবিদদের কাছে। টাকার বিনিময়ে কেনা হতো তাদের আনুগত্য এবং নষ্ট করা হতো তাদের চরিত্র। মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আজ অবধি এই ধারাটা চলে আসছে ক্রমবর্ধিতভাবে।

আমি আর একটা বিষয়ে আলোকপাত করেছিলাম, ওটাও একটা গুরুতর অভিযোগ—কোনো কোনো সেক্টর অধিনায়ককেও যুক্ত থাকতে দেখা গেছে, তাঁরা সুকৌশলে বা বল প্রয়োগ করে নিয়মিত টাকা আদায় করতেন—এ বিষয়ে এ কে খন্দকার যদি আলোকপাত করেন—তাহলে ভালো হয়। এর আগে এস আর মীর্জাও বলেছেন।

এস আর মীর্জা : এ সম্পর্কে আমি আরও কিছু বলব। ১৯৭৫ সালে এক মুক্তিযোদ্ধা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কথায় কথায় ওই মুক্তিযোদ্ধা আমাকে বললেন, 'স্যার, বঙ্গবন্ধু বলতেন, টাকা খরচ কোরো না, ফুলের মালা দিয়ে বিয়ে কোরো। অথচ তিনি নিজে তাঁর ছেলেদের বিয়ে দিচ্ছেন সোনার মুকুট পরিয়ে এবং সেটা টিভিতে দেখানো হচ্ছে। এই যে দুই রকমের মান ও কথার অসংগতি—এটা তো মানুষ গ্রহণ করবে না।'

তারপর আমার এক বন্ধু, তাঁর নাম বলব না, যিনি শেখ সাহেবের বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি যখন-তখন শেখ সাহেবের বাড়িতে যেতে পারতেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন, তিনি তেল কোম্পানিতে কাজ করতেন, স্বাধীনতার পর শোনা গিয়েছিল শেখ কামাল ব্যাংক লুট করতে গিয়ে গুলি খেয়ে হাসপাতালে ছিলেন, ওই ভদ্রলোক বললেন, "আমি তারপর বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেছি, তখন দুপুর, শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরা খাবারঘরে খাচ্ছেন। আমি যেতেই শুনলাম, শেখ সাহেব বলছেন, 'তোদের যখন লোক ধরে মারতে আরম্ভ করবে, তখন আমি যে কী করব! আমি জানি না'।" এ কথা থেকে সহজেই অনুমেয় নেতৃত্বের মধ্যেই গলদ ছিল।

এ কে খন্দকার : আমি যে কথা এখন বলব, তার সূত্র আমি আগেই উল্লেখ করেছি। ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে যে লুটপাট, লুটতরাজ আরম্ভ হলো দেশে, এতে কিন্তু কোনো একটা বিশেষ সংগঠন কিংবা কোনো একটা বিশেষ দলের ওপর সার্বিকভাবে দায়দায়িত্ব চাপানো যায় না। বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন দল, বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু খারাপ লোক একত্র হয়ে এ কাজ করেছে। একটা কথা আমি বিশ্বাস করি, দেশের একটা বিরাট জনসংখ্যা সত্যিকারের ভালো মানুষ। তারা চায় শান্তিতে জীবন ধারণ করতে। কিন্তু একটা ছোট অংশও যদি খারাপ হয়, তাহলে সেই খারাপ অংশটার প্রতিপত্তি কিন্তু অনেক সময় অনেক বড় হয়ে দেখা দেয় তাদের সংখ্যার তুলনায়। তেমনিভাবে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারীদের মধ্যে কিছু লোক—এর মধ্যে সেক্টর অধিনায়ক, সাব-সেক্টর অধিনায়ক দু-চারজন ছিলেন, যাঁদের বিরুদ্ধে লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তও করা হয়েছিল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, যুদ্ধের সময় সমস্ত প্রমাণ, সাক্ষী, তথ্য—এসব হাজির করা খুব কঠিন ব্যাপার। তখন তো যোগাযোগব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ফলে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করে একটা শাস্তির ব্যবস্থা করা বা একটা জিনিস প্রমাণ করা কঠিন ছিল। তা সত্ত্বেও যেখানে যেখানে আমাদের সন্দেহ হয়েছিল, আমাদের মনে হয়েছিল যে এই দু-চারজন মানুষ লুটপাটে ব্যাপৃত ছিল, তাদের কিন্তু নিজ জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবার এমনও হয়েছে যে লুটপাট করা সত্ত্বেও তাদের সরানো সম্ভব হয়নি।

আমি আবারও যে কথা বলতে চাইছি, মুক্তিযোদ্ধারা তো বাংলাদেশেরই মানুষ, বাংলাদেশের মানুষ দিয়েই এই বাহিনী গঠিত। মুক্তিযুদ্ধের যাঁরা সেক্টর অধিনায়ক, সাব-সেক্টর অধিনায়ক, কিংবা জ্যেষ্ঠ নেতা, কিংবা যাঁরা সাধারণ যোদ্ধা, তাঁরা সবাই এবং আমরা সবাই বাংলাদেশের মানুষ ছিলাম। সুতরাং যেমন সমাজের প্রতিটা স্তরে, প্রতিটা কোণে কিছু খারাপ লোক ছিল, তাঁদের ওপর বিশেষ কোনো কলঙ্ক আরোপ করা বোধহয় ঠিক হবে না। এ ধরনের খারাপ লোক সবখানেই পাওয়া যায়। তবে মুক্তিযুদ্ধে যেসব লোকের বিরুদ্ধে এ রকম অভিযোগ ছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর কিছু কিছু তদন্ত করা হয় এবং কয়েকজনকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও সবার বিরুদ্ধে যে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল, তা নয়।

মঈদুল হাসান : আমি যতটুকু জানি, সেক্টর অধিনায়কদের দুর্নীতিসংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তের ভার আপনার ওপরই পড়েছিল। আমাদের যে শরণার্থী তাদের কাছ থেকে এক সেক্টর অধিনায়ক টাকা তুলতেন নিয়মিতভাবে। লুটপাট করেও টাকা নিয়ে আসতেন। নারীঘটিত ব্যাপারেও তিনি জড়িত ছিলেন। এ জন্য তাঁর বিরুদ্ধে

আনীত অভিযোগ তদন্ত করে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। রেকর্ডে রাখার জন্যই তাঁর নাম ও এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ আপনার বলা দরকার।

এ কে খন্দকার : ঘটনাটি মনে আছে, তবে বিশদ বলতে পারব না। যদিও তদন্তের ভার আমার ওপরই পড়েছিল, কিন্তু তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এটুকু পরিষ্কার মনে আছে। তিনি সেক্টর অধিনায়ক না থাকলেও সেক্টর অধিনায়কের কাছাকাছি পর্যায়ের নেতা ছিলেন। নামটা মেজর এম এ জলিল। আমরা বাংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার থেকে চিঠিও ইস্যু করেছিলাম এ ব্যাপারে।

এর আগে মার্চ মাসে লুটপাট প্রসঙ্গে আপনি যে কথা বললেন, সেটা সত্য কথা। এটা ১ মার্চের পরই ঘটে। তবে আপনি জায়গাটা ফার্মগেটের কাছাকাছি বলেছেন। আসলে জায়গাটা ছিল ফার্মগেটের একটু দূরে, এখন যেখানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। ওই জায়গায় অবাঙালিদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা কেড়ে নেওয়া হতো। কারণ জায়গাটা আমার বাসার কাছে ছিল বলেই এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল।

যে কথা আমি বারবার বলি, কোনো সমাজের কোনো অংশকে সাধারণভাবে দুষ্কৃতকারী কিংবা খুব ভালো লোক এমন কথা বলা যায় না। তেমনি তখন যারা অবাঙালি ছিলেন, তাঁরা সবাই খারাপ লোক ছিলেন—এ কথা আমি মানতে রাজি নই। সেই সময় ভয় পেয়ে বহু ভদ্র পরিবার, নিরীহ পরিবার ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে থাকে। তখন বাধা দেওয়া হলো রাস্তায়। বলা হলো, আমাদের দেশের সম্পদ তারা নিয়ে যাচ্ছে, তাদের সেসব নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। আমার প্রশ্ন হলো, নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না—এ কথা বলার অধিকার কে তাদের দিল? কোন অধিকারে তাদের অর্থ, সোনার গয়না কেড়ে নেওয়া হলো?

আমার জানামতে, তারা সমানে টাকা-পয়সা, সোনার গয়নাসহ জিনিসপত্র নিতে আরম্ভ করল এসব পরিবারের কাছ থেকে, যারা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছিল। এসব মালামালের, অর্থের কোনো হিসাব ছিল না, কোনো প্রমাণও ছিল না। এর বিরুদ্ধে কিন্তু তখন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। হয়তো সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব ছিল না। আমি যে কথা বলছি, এই যে লুটপাটের সংস্কৃতি তৈরি হলো, মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এমনকি আজ পর্যন্ত এই ধারা আরও বিরাট আকারে, আরও ভয়ংকররূপে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে তুলেছে।

এস আর মীর্জা : এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটু কথা বলতে চাই। আমার মতে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ চারবার লুটের শিকার হয়। প্রথমে লুট শুরু হয় মার্চে। তারপর তো আমরা বেরিয়ে গেলাম। দিনাজপুর-পাবনা এলাকার কথা আমি জানি,

ওখানকার হিন্দুরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল ভারতে চলে যাওয়ার জন্য, তখন কিছু মুসলমান সাহায্য করেছিলেন হিন্দুদের। যেমন পাবনায় আমার ভায়রা ছিলেন রাজা মিয়া, তিনি সাহায্য করেছেন; পঞ্চগড়ের বোদা থানায় আমার মামা ছিলেন, তিনি হিন্দুদের চলে যেতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু সীমান্তে কিছু মুসলমান, কেবল দিনাজপুর এলাকায় নয়, অন্যান্য বেশ কয়েকটি এলাকায়, বিশেষ করে ময়মনসিংহ এলাকার মানুষ হিন্দুদের সমস্ত কিছু—বাসনপত্র, টাকা-পয়সা, সোনাদানা যা ছিল, এমনকি কাপড়চোপড় পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে তারপর ভারতে চলে যেতে দিয়েছেন। এসব অসহায় মানুষ রিক্ত হস্তে ভারতে পৌছায় কেবল প্রাণে বাঁচার জন্য।

আরেকটা কথা বলি, মঈদুল হাসান যখন বললেন লুটের কথা, তাহলে ঠাকুরগাঁওয়ের কিছু কথা বলি। আপনারা তো জানেন, মার্চ মাসে একটা সংগ্রাম কমিটি করা হয়েছিল সব জায়গাতেই। মানুষ আওয়ামী লীগের সংগ্রাম কমিটি বলত। আমি যখন ঢাকা থেকে যাচ্ছিলাম ঠাকুরগাঁওয়ে, তখন দেখেছি, বগুড়ার শেরপুরে ছিল সংগ্রাম কমিটি, বগুড়ায় ছিল। ঠাকুরগাঁওয়ে এমপি ছিলেন আমার বন্ধুমানুষ। সেখানকার অন্য নেতাদেরও আমি চিনতাম, যেহেতু আমি ঠাকুরগাঁওয়ের মানুষ। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু এবং স্কুলজীবনের বন্ধু। ঠাকুরগাঁওয়ে যখন ইপিআর বিদ্রোহ করল, তখন ওই বাহিনীর অবাঙালি কিছু সৈনিক ও কর্মকর্তা প্রাণ হারান। কিছু অবাঙালি, যাঁরা বিহারি নামে পরিচিত, তাঁদের অনেকেই নিহত হলেন বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে। এসব জায়গা থেকে টাকা-পয়সা, সোনাদানাসহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিস লুট করা হলো। তখন একজনের ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল এগুলো নিরাপদে রাখার জন্য। যাঁর কাছে এসব গচ্ছিত ছিল, তিনি পরে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কিছুই করেননি। সেখানে তাঁর এক আত্মীয় ছিলেন—সেখানেই তিনি যুদ্ধের পুরো সময়টা ছিলেন এবং বেশ ভালোভাবে ছিলেন। এটা আমি জানি।

এরপর তৃতীয় পর্যায়ে আরেক লুট শুরু হলো। এটা করল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। উত্তরবঙ্গ থেকে চালভর্তি গাড়ি আসত ঢাকায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা এসব চাল জোর করে রেখে দিত। এখন যিনি পেপসি-কোলার মালিক, আমানউল্লাহ—সে সময় তিনি চালের ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে সৈন্যরা তাঁর কাছে চাল বিক্রি করত খুবই কম দামে। সৈন্যরা তাঁকে বলত, 'চাউল লে যাও, রুপিয়া দেও।' তিনি তো মহা খুশি। তিনি ওই চাল বিক্রি করেই বিপুল অর্থের মালিক হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর অবশ্য তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। তবে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর আমরা যখন স্বাধীনতার পর দেশে ফিরলাম, তখন আবার লুট শুরু হলো। সুতরাং পূর্ব বাংলা এক বছরের মধ্যে চারবার লুটপাটের শিকার হলো।

আমি এ সময় বহু ভারতীয় সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে মিশেছি। যেহেতু ভারত সব সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে—আমি তখন কোনো দিন কোনো ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাকে তাঁদের কোনো রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে কোনো আলোচনা বা বিরূপ মন্তব্য করতে শুনিনি। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও অরাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে সেনাপ্রধান আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পর দুটো জিনিস হলো—সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিকীকরণ করা হলো এবং দুর্নীতি গোটা সেনাবাহিনীকে গ্রাস করল। এর ধারাবাহিকতায় আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যেও দুর্নীতি এল।

মঈদুল হাসান : আমি আরেকটু যোগ করব। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসানের পর নেলসন ম্যান্ডেলার আমলেই সেখানে একটা 'ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস' কমিশন গঠন করা হয়, যেখানে সেসব অত্যাচারের মধ্য দিয়ে বা সেসব আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সব পক্ষের মধ্য থেকেই যাঁরা সত্য কথা বলেন, তাঁরা অন্য সবাইকে ডেকে এনে, তাঁদের একত্র করে সেই কথাগুলো লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। এভাবেই কিন্তু একটা সমাজকে পরিষ্কার করা যায়। কেবল একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়কে দেখা বা বিচার করার প্রয়াস—এটা দিয়ে কিন্তু একটা সমাজকে পরিশুদ্ধ করা যায় না, কলঙ্কমুক্তও করা যায় না। আমাদের সবাইকে সত্য জানতে হবে, সত্যকে বুঝতে হবে। কোথায় সেই সত্য, কবে কতখানি অন্যায় হয়েছে, সেটা অকপটে স্বীকার করার মতো আমাদের মনোবৃত্তি ও সাহস থাকতে হবে—তার পরই একটা সমাজকে আবার একটা সমন্বিত, সংহত রূপ দেওয়া সম্ভব হবে। আমাদের সমাজ সেদিক থেকে অত্যন্ত বিভক্ত এবং অনেকটাই যুক্তি ও নৈতিকতাবোধবর্জিত।

আমার মনে হয় যে মানুষ এখন মুক্তিযুদ্ধের সত্য কথাগুলো জানতে চায়। দলীয় রাজনীতির প্রচার-মতবাদের অস্ত্র হিসেবে নয়, সত্য কথা, প্রকৃত ঘটনাটা, পক্ষপাতিত্বহীনভাবেই তাদের বলা উচিত, যাতে সমাজ ঠিক ও বেঠিক, ভালো ও মন্দ প্রশ্নে কতগুলো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে। তার মধ্য দিয়েই কিন্তু এ সমাজটাকে, বহুধারায় বিভক্ত এ সমাজকে একত্র করা যাবে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের
পটভূমি নিতান্ত সরল ছিল না। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর
অবস্থান ছিল সংঘাতময়। অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলিরও
ছিল নানামুখী স্রোত।
মুক্তিযুদ্ধের তিনজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর অন্তরঙ্গ
এই কথোপকথন উন্মোচন করেছে
সে সময়ের নানা অজানা তথ্য। গভীর বিশ্লেষণ
জানা তথ্যে যুক্ত করেছে নতুনতর মাত্রা।
মুক্তিযুদ্ধে আগ্রহীদের জন্য
অবশ্যই সংগ্রহে রাখার মতো একটি বই।